নানারঙা রঙধনু

মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ

শুরুর কথা

জীবন বহতা নদীর মতো। বয়ে যাচ্ছে। গোটা পৃথিবী অন্তিম পরিণতির দিকে হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগুচ্ছে। পৃথিবীর নানা প্রান্তে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে নানাবিধ ঘটনা। বেশির ভাগই দুঃখের। কান্নার। শোকের। হারানোর। অপ্রাপ্তির। কষ্টের এই আখ্যানগুলো বেশির ভাগই মুসলিম উম্মাহকে ঘিরে।

মুসলিম উম্মাহ এক দেহের মতো। আমার আচরণ কি সেটা প্রমাণ করছে? দেহের একটা অংশ হয়েও কি বাকি অংশের বেদনা টের পাই? টের পেলেও, সামান্য কয়েকটা টাকা ছিটিয়ে দিলেই বুঝি দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়? টাকাতেই কি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়?

আমরা প্রায় সবাই মুসলিম-বিশ্বের করুণ অবস্থা নিয়ে ভাবি। দুশ্চিন্তা করি। হা-হুতাশ করি। আমাদের সবার মনেই হাহাকার, কেন আমাদের এই অবস্থা! আমরা কেন পড়ে পড়ে মার খেয়ে চলেছি। এর প্রতিকার কী? এ সংকট থেকে উত্তরণের উপায় কী? কেন আমরা রুখে দাঁড়াচ্ছি না? কেন পাল্টা আঘাত হানছি না?

শুনতে খারাপ লাগতে পারে, তবুও না বলে উপায় নেই, আমাদের এই মায়াকান্নার অনেকটাই মেকি! লোকদেখানো! আমরা কাঁদতে পছন্দ করি! কাঁদলেই মনে করি দায়িত্ব পালন হয়ে গেল। বুক থেকে পাষাণের ভার নেমে যায়! যেন জগদ্দল পাথর চেপে ছিল, টাকা দিয়ে আর ফোঁস ফোঁস করে দু-ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়ে, বেশ অনেকটা করে ফেলেছি!

একজন বেশ গর্ব করে বুক ফুলিয়ে বলছিল :

-জানেন, আমরা কত টাকা নিয়ে গিয়েছি? ... লাখ টাকা নিয়ে গিয়েছি!

-বাব্বাহ! এত্ত টাকা? তা হলে ভালোই হলো, আশা করি মাজলুম ভাইদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে! তারা সবাই অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান পেয়ে গেছে! নিজেদের ভিটেমাটি ফিরে পেয়েছে! হারানো মা-বোন-বাবা-ভাইদের ফিরে পেয়েছে!

তিনি তর্ক জুড়ে দিলেন! ভাব দেখালেন নিজে কিছু তো করেনই না উল্টো অন্যদের কাজে বাগড়া দেন! আগে এত 'লাক' টাকা জোগাড় করে দেখান! তারপর গালভরা বুলি ছাড়তে আসবেন! হুঁ হুঁ!

দিবাস্বপ্নে বিভোর মানুষের সাথে কথা চালিয়ে যাওয়া নিতান্তই বোকামি! তাকে বলতে পারতাম, ভাই রে, আপনি যা করেছেন, সেটা বিরাট বড় একটা কাজ হয়েছে! এতে কোনো সন্দেহ নেই! গৃহহীন ভাইবোনদের অনেক উপকার হয়েছে! আমরা আপনার অসামান্য মেহনতকে খাটো করছি না! হালকা চোখে দেখছি না। আমরা শুধু বলতে চাইছিলাম, টাকা দিলেই ভাইদের সমস্যার সমাধান হবে না! তাদের জন্য তো আরও অনেক কিছু করার অবকাশ আছে!

সবার নাকের ডগায় গোস্বা! নিজের চিন্তার বিপরীতে কিছু শুনলেই ফাঁৎ করে ফণা তুলে ফেলে! মুখ খোলা মুশকিল! ফণা তোলাটাও ভয় দেখানোর জন্যে হলে সারা যেত। এ যে রীতিমতো ছোবলও হানতে শুরু করে! তাও এক দুবার নয়, একনাগাড়ে ছোবল দেগেই যেতে থাকে! সামনে তো মারে মারে, অজান্তে পিঠেও বিষ উগরে দিতে কসুর করে না! তাদের এহেন সরোষ সহিংস প্রতিক্রিয়া দেখে, বাধ্য হয়েই নিরস্ত হতে হয়! নিজের আবেগকে হজম করে ফেলতে হয়!

তবে অন্যরা কে কী করছে, শুধু সেদিকে তাকিয়েই বসে না থেকে, নিজের গণ্ডি থেকেই কিছু করার কসরত চালিয়ে যাওয়া আবশ্যক! কাজ না করে বেশি কথা বলা, অন্যের কাজে খুঁত ধরা, ছিদ্রান্বেষণ করা আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে! প্রথমে নিজেকেই প্রশ্ন করি।
-তুমি কী করছ? তারা কিছুটা হলেও নড়াচড়া করছে! কিছু টাকা হলেও দিয়ে পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে!

বিশ্ব আজ দ্রুতলয়ে পট পরিবর্তন করে যাচ্ছে। এসব পরিবর্তন বড় কিছু ঘটার ইঙ্গিত বহন করে। কালের গর্ভে কী লুকিয়ে আছে সময়ই তা বলে দেবে। আমরা বড় উদাসীন হয়ে কালাতিপাত করছি! কোনো কিছুতেই আমাদের হেলদোল নেই! মাথাব্যথা নেই। সমস্ত মুসলিম উম্মাহ এক দেহের মতো, এটাকে আজ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস বলে মনে থাকে না। কর্তব্য তো দূরের কথা।

এ অবিমৃষ্যকারিতার শাস্তি আমাদের পেতেই হবে। কোনো সন্দেহ নেই। সেই আন্দালুস হাতছাড়া হওয়ার পর থেকেই আমাদের ওপর বড় একটা গুরুদায়িত্ব চেপে বসেছে! আমরা স্বীকার করি আর না করি! এ এক তিক্ত বাস্তবতা! রূঢ় সত্য!

সূচিপত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

জীবন জাগার গল্প : ৬১৯

কালো পাহাড়ের ‘নান’!

মানুষটাকে দেখতে মনে হয় আরব। কিন্তু সাথের মেয়েটার চেহারা বলে ভিন্ন কথা! আবার মেয়েটা মিষ্টি স্বরে ‘আবী’ বলেও ডাকছে! তারমানে বাবা-মেয়ে। কিন্তু ঠিক মিলছে না ব্যাপারটা! মেয়েকে দেখলে ঠিক আরব মনে হয় না। ইউরোপিয়ান-ইউরোপিয়ান লাগে! এটা অবশ্য বিচিত্র কিছু নয়। আরবে এমন ‘শংকর বিয়ে’ অহরহ-আকসার হচ্ছে! এখানেও একই ‘কেইস’ হবে হয়তো! তারপরও গল্পের আশায় পিতার সাথে আলাপ জমাবার চেষ্টা করলাম। জুব্বার ধরনে মনে হয় মানুষটা আলজেরিয়ান! আলাপ জমিয়েই দেখা যাক না!

★★★

আকারে-ইঙ্গিতে জেনে নিলাম, তিনি সত্যি সত্যি আলজেরিয়ান। তাকে আলাপে আগ্রহী করে তোলার জন্যে প্রথমেই ফরাসিদের বদনাম শুরু করলাম। তারপর আলজেরিয়ার ইতিহাসের টুকরা-টাকরা যা জানা ছিল, সব উগরে দিলাম। লোকটাকে বেশ সন্তুষ্ট-পরিতৃপ্ত মনে হলো। খাইরুদ্দীন বারবারোসার কথা আসতেই তিনি রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। আমাকে একপ্রকার থামিয়েই কথা বলতে শুরু করলেন। শুরু হলো দীর্ঘ ইতিহাস। ফেলে-ছড়িয়ে, বাদ-কাট করে মূল ঘটনাটাই বলি।

-আমার পূর্বপুরুষ খাইরুদ্দীনের সাথেই জাযায়েরে এসেছিল! সুলতান সুলাইমান কানূনীর শাসনামলে।

-বেশ ইতিহাসের সুবাস পাওয়া যাচ্ছে দেখছি?

-আরে সুবাসের কী দেখলেন, আমাদের পরিবার রীতিমতো ইতিহাসের খনি!

-বলুন না শুনি! আমার সময় আছে! আপনি সব খুলে বলুন।

-আমাদের পূর্বপুরুষ বাস করত 'কালো পাহাড়ের' দেশে। বর্তমানে যাকে আমরা 'মন্টিনিগ্রো' বলে চিনি। আরবীতে বলা হয় 'আল জাবালুল আসওয়াদ'। সুলতান মুহাম্মাদ ফাতিহের আমলে পুরো বসনিয়া অঞ্চল উসমানী সালতানাতের অধীনে এসেছিল। আমাদের এলাকার মানুষ উসমানীদের প্রভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। আমাদের বংশ ছিল সৈনিক বংশ। অনেক যুবক উসমানীদের জানেসারীন বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। তাদের কেউ কেউ চাকরি শেষে বিয়ে থা করে ইস্তাম্বুলেই থিতু হয়েছিল। কেউ কেউ অন্য কোথাও। আমার পূর্বপুরুষও প্রথমে ইস্তাম্বুলে, পরে খাইরুদ্দীন বারবারোসার সাথে আলজেরিয়াতে এসেছিল।

***

প্রথম দিকে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যোগাযোগ ছিল। আমাদের বংশের মূল অংশটা মন্টিনিগ্রোতেই থেকে গিয়েছিল। উপকূলবর্তী শহর 'বার'-এ। এখানে থেকে যাওয়া আত্মীয়দের সাথেও যোগাযোগ ছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে, বলকান-যুদ্ধে বলকান অঞ্চলটা উসমানী সালতানাতের হাতছাড়া হয়ে যায়। পুরো অঞ্চলের মুসলমানদের ওপর নেমে আসে নির্যাতনের স্টিমরোলার। বেশির ভাগ মানুষ হিজরত করে মূল সালতানাতে চলে আসে। যারা সাহস করে থেকে গিয়েছিল, তাদের হাজার হাজারকে জোরপূর্বক খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হয়। বলকান অঞ্চলের সে এক বিভীষিকাময় অন্ধকার অধ্যায়।

-এই মামণিটা আপনার মেয়ে?

-জি।

-কিন্তু চামড়ার রঙে মিল খাচ্ছে না যে?

-জি, এতক্ষণ যা বললাম সেটাকে অতি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা বলতে পারেন! মেয়ের কথা বলতে গেলে ভূমিকাটুকুর প্রয়োজন ছিল!

-আচ্ছা তাই! তা হলে এবার মূল পর্বে আসা যাক। কী বলেন? তা মামণিটার নাম কী?

-ওর দাদার ইচ্ছে 'ফাতেমা' বলে ডাকেন! কিন্তু ওর মায়ের ইচ্ছে ছিল

'মারয়াম'!

-ছিল মানে?

–আবার একটু পেছনে যেতে হবে। মার্শাল টিটো (১৮৯২-১৯৮০)-এর মৃত্যুর পর, বলকান অঞ্চলের দিকে দিকে স্বাধীনতা-আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। আস্তে আস্তে আন্দোলন গৃহযুদ্ধ (১৯৯১-১৯৯৯)-এর রূপ পরিগ্রহ করে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বসনিয়া-হার্জেগোভিনা-কসোভো অঞ্চল। এখানে যা ঘটেছিল সেটাকে গৃহযুদ্ধ (১৯৯২-১৯৯৫) না বলে গণহত্যা বলাই বেশি যুক্তিযুক্ত। যুদ্ধের প্রভাবে মার্শাল টিটোর গড়ে তোলা যুগোশ্লাভ ফেডারেশন সাতটা স্বাধীন রাষ্ট্রে ভেঙে পড়ে। মন্টিনিগ্রো ছিল সাতটির একটি। অবশ্য এ দেশটা পুরোপুরি স্বাধীনতা পেয়েছিল ২০০৬ সালে। সার্বিয়া থেকে।

***

গণহত্যার প্রভাব পাশের অঞ্চল মন্টিনিগ্রোতে এসে পড়ে। এখানে জোরপূর্বক ধর্মান্তরের পরও বেশ কিছু মুসলমান থেকে গিয়েছিল। তাদের ওপর নির্যাতন চালানো হলেও অন্য এলাকার তুলনায় মাত্রা কিছুটা কম ছিল। তাই বসনিয়া থেকে আত্মরক্ষার্থে পালিয়ে বেশ কিছু মুসলিম পরিবার মন্টিনিগ্রোতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন খবর পড়ে আমরা ভীষণ অস্থির হয়ে পড়লাম। শত হলেও নাড়ির টান। এমনিতে আমি ইতিহাসের ছাত্র। আমাদের পরিবারের একটা অংশ সেখানে থাকে। এটা জানার পর থেকে একবার দেখে আসার তাকিদ অনুভব করছিলাম। তখন আমি ভার্সিটিতে পড়ি। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আরও বেশি উতলা হয়ে পড়লাম।

মনে মনে চিন্তা করলাম, মন্টিনিগ্রোতে আশ্রয় নেয়া বসনিয়ান উদ্বাস্তুদের জন্যে কোনো ত্রাণের ব্যবস্থা করা যায় কি না। তুরস্কে-সৌদি আরবে, আলজেরিয়াতে ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে যোগাযোগ শুরু করলাম। বেশির ভাগই খুবই উৎসাহের সাথে সাড়া দিল। সবাই সাধ্যানুযায়ী আর্থিক সাহায্য করল। আমার দুজন কাজিনও সাথে যাবে বলে সম্মতি দিল। সব প্রস্তুতি শেষ হলো। ও হ্যাঁ, আমরা আলজেরিয়া থেকেই রওনা দেব ঠিক করলাম। কারণ, যাব সাগরপথে। অড্রিয়াটিক সাগর দিয়ে সোজা আমাদের পূর্বপুরুষের শহর 'বার'-এ গিয়ে পৌছব। এ ছাড়া নিরাপদ কোনো রুট ছিল না। স্থলপথে

গেলে সমূহবিপদ। ত্রাণসামগ্রী নিয়ে আকাশপথে যাওয়া রীতিমতো অসম্ভব!

***

আমার পরদাদারা তো একসময় নৌ-মুজাহিদই ছিলেন। বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম সেরা অ্যাডমিরাল খাইরুদ্দীন বারবারোসার সহযোদ্ধা ছিলেন। আমরা বাপ কা বেটা এক শ ভাগ না হলেও সিকি ভাগ হওয়ার দাবি তো করতেই পারি! জলপথের টুকটাক অভিজ্ঞতা নিয়ে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে বেরিয়ে পড়লাম নোনাজলে। আমাদের নৌযানের যিনি ক্যাপ্টেন তিনি বেশ অভিজ্ঞ এবং পোড়-খাওয়া মানুষ। পুরো জীবন সমুদ্রে কেটেছে বললে ভুল বলা হবে না। তাকে পেয়ে আমরা একপ্রকার নিশ্চিন্ত!

***

লম্বা কথায় না গিয়ে বলব, অনেক বাধা-বিপত্তি পাড়ি দিয়ে 'বার'-এ গিয়ে নোঙর ফেললাম। মন চাইছিল তখনই ছুটে যাই। খুঁজে বের করি হারিয়ে যাওয়া আত্মীয়দের। কিন্তু বন্দর কর্তৃপক্ষের কড়াকড়িতে ছাড়পত্র পেতে সময় লাগল। তাদের আশ্বস্ত করতে পারলাম, আমরা কোনো অস্ত্রশস্ত্র নয়, স্রেফ নিরীহ ত্রাণ নিয়ে এসেছি।

***

'বার' শহরটা বলতে গেলে একেবারে দেশের শেষ মাথায়। সাগরের পেটে। এখানে এতদূরেও জানমাল নিয়ে অসংখ্য উদ্বাস্তু বসনিয়ান এসেছে। আগেই খবর নিয়ে জেনেছি। শুরু হলো তাদের মাঝে ত্রাণ-বিতরণ। আস্তে আস্তে অন্য শহরেও যাব। ত্রাণ-বিতরণের পাশাপাশি আমাদের অনুসন্ধান-পর্বও চলছিল। সারা দিন কাজ করে রাতে বোটে এসে থাকতাম। একদিন বেশ দূরে চলে গেলাম। রাত হয়ে গেল। গাড়ি-ঘোড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। ভয় ভয় করছিল। এমনিতে এলাকায় মুসলমান থাকলেও খ্রিষ্টানের সংখ্যাই বেশি। অনেক বেশি। তারা এমনিতেই উদ্বাস্তুদের নিয়ে অসন্তুষ্ট; তার ওপর আমাদের উপস্থিতিটাও মেনে নিতে পারছিল না। কিন্তু কিছু বলতেও পারছিল না।

***

হাঁটতে হাঁটতে একটা গির্জা সামনে পড়ল। বেশি কিছু না ভেবে ফটকে করাঘাত করলাম। এক বৃদ্ধা নান ঘুলঘুলি দিয়ে মাথা বের করলেন। কিছু না ভেবে তার কাছে সত্যি কথাই বললাম। তার চেহারায় দ্বিধার আভাস

দেখে অনুনয় করে অনুরোধ করলাম। এও বললাম, আমাদের পূর্বপুরুষ এই অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। আমরা তাদের খোঁজে এসেছি। বৃদ্ধার চেহারায় বিস্ময় আর কৌতূহলের ছাপ ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। বাতির আবছা আলোয় মনে হলো, কাজ হয়েছে। আশ্রয় মিলেছে।

***

ফটক খোলা হলো। গির্জার চত্বরে দেখলাম, কিছু উদ্বাস্তু আশ্রয় নিয়েছে। তাদের দেখে ভ্রু কিছুটা কুঁচকে গেল। মনে একধরনের আশঙ্কা জেগে উঠল। কারণ, শহরে পা দিয়েই শুনেছি, এখানে আশ্রয় নেয়া মুসলমানদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে গির্জার কিছু অতিউৎসাহী পাদরি, খ্রিষ্টবাদ প্রচারে নেমে পড়েছে। নইলে খেদিয়ে দেয়ার হুমকি দিচ্ছে। আমাদের একটা রুমে নিয়ে বসানো হলো। অদূরে গির্জার মূল হলঘর থেকে সম্মিলিত গানের আওয়াজ আসছিল। সবই মেয়েকণ্ঠ। পরে জেনেছি এখানে নানদের ট্রেনিং দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে তাদের বিভিন্ন গির্জা বা এলাকায় পাঠানো হয়।

***

আমাদের সুন্দর ছিমছাম একটা মেহমানখানায় থাকার ব্যবস্থা করে দেয়া হলো। প্রধান পাদরি এলেন। কুশল বিনিময় করলেন। মেকি হোক বা আসল, আদর-আপ্যায়নের কমতি করলেন না। বৃদ্ধা নান বার বার খোঁজ নিয়ে গেলেন। কোনো অসুবিধে হচ্ছে কি না জানতে চাইলেন। দুজন তরুণী নান এসে ঘরদোর গুছিয়ে-বাছিয়ে দিয়ে গেল। আমরা দুই নানকে দেখে রীতিমতো আকাশ থেকে পড়লাম। তারা বেশ আগ্রহ করেই আমাদের সাথে পরিচিত হলো। আমরা কেন এসেছি বিস্তারিত খোঁজ-খবর করল। দুজনেই ভীষণ অবাক! আমরা এতদূর থেকে শুধু ত্রাণ দিতে এসেছি! প্রাণের মায়া ত্যাগ করে!

-শুধু ত্রাণ-বিতরণ করতেই এসেছি, এটা অবশ্য ঠিক নয়! আরও একটা কাজ আছে!

-কী কাজ?

এর মধ্যে আরও কয়েকজন নান এসে দেখা দিয়ে গেল। সবাই কুশল বিনিময় করতে এসেছে! একে একে আরও এল। কুশল বিনিময়ের বহর দেখে আমাদের চোখ কপালে ওঠার জোগাড়! আমার মনে ক্ষীণ একটা সন্দেহ কুটকুট করে উঠল। ওরে, সতর্ক হ! ফাঁদে পড়িস না। ভেতরে

ভেতরে সতর্ক হয়ে গেলাম। আল্লাহর কাছে হেদায়াতের দোয়া চাইলাম। ফিতনা থেকে মুক্তি চাইলাম। বিস্ময় উত্তরোত্তর বেড়েই চলছিল। সব নানই ডানাকাটা পরী! কী ব্যাপার! এরা কি আসলেই ধর্ম প্রচার করবে নাকি অন্য কিছু? ভেতরের চিন্তা আপাতত ধামাচাপা দিয়ে আলাপে ফিরে এলাম।

-কাজ হলো, শেকড়-সন্ধান!

-সেটা আবার কী?

-আমরা তিনজন কাজিন। আমাদের পূর্বপুরুষরা এখানেই বাস করতেন। আমাদের অনেক আত্মীয়-স্বজন এখানেই বসবাস করতেন। আমি কয়েক শ বছর আগের কথা বলছি!

-ও জেসাস, তাদের সন্ধান পেয়েছেন?

-কী করে পাব? এতদিনে বিচ্ছিন্নতার পর যোগসূত্র বের করা দুরূহ ব্যাপারই বটে!

-আপনাদের আত্মীয়রা কি সবাই মুসলমান ছিলেন?

-জি না, অনেকে খ্রিষ্টান ছিল। আবার কাউকে জোরপূর্বক খ্রিষ্টান বানানো হয়েছে!

-না, আমার কাউকে জোরপূর্বক খ্রিষ্টান বানাই না! বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজি করে তবেই দীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করি!

-আচ্ছা এ নিয়ে এখন বিতর্কে না জড়ানোই ভালো!

বৃদ্ধা এসে তরুণীদের ডেকে নিয়ে গেল। শোয়ার আগে বোধহয় তাদের কোনো 'প্রেয়ার' আছে। গানের সুর ভেসে এল। সম্মিলিত। রাতের খাবার দেয়া হলো। বৃদ্ধা এলেন। সাথে এল প্রথম দুই নান। পাদরি এসে রাতের মতো বিদায় নিয়ে গেলেন। বালিশে মাথা রেখে ভাবনার অতলে হারিয়ে গেলাম। খ্রিষ্টানরা গোটা বলকান অঞ্চলকে অধ্যুষিত বানানোর মাস্টার প্ল্যান হাতে নিয়েছে নিশ্চয়। কীভাবে এটাকে রোধ করা যায়! ভেতরের খবর কীভাবে জানা যায়!

***

রাত ভোর হলো। নামায পড়ে গির্জার সাজানো গোছানো বাগানে পায়চারি করতে বের হলাম। কয়েকজন নান গাছে পানি দিচ্ছিল। আমাদের বেশ সপ্রতিভ সম্ভাষণ জানাল। রাতে ঘুম কেমন হয়েছে জানতে চাইল। এতগুলো কালো পোশাকী সুন্দরী নানের ভিড়ে বেশ অস্বস্তি বোধ

করছিলাম। কিছুক্ষণ পর রুমে ফিরে এলাম। বিদায় নেয়ার তোড়জোড় শুরু করলাম। সাতসকালেই আমাদের জন্যে চা নিয়ে হাজির হলো রাতের দুজন। চলে যাব বলাতে, নাস্তা করে যাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করল। রাজি না হয়ে উপায় ছিল না। সামান্য পরেই নাস্তা চলে এল। এর মধ্যে বিছানা গুছিয়ে রাখল। এবার বিদায়ের পালা। আবার আসার দাওয়াত দিল। পাদরি এসে বার বার ক্ষমা চেয়ে নিলেন। আরেক দিন এসে চা খেয়ে যেতে বললেন। বিশেষ আলাপ আছে বলে জানালেন। আমাদের সাথে একদিন এসে দেখা করে যাবেন বলেও কথা দিলেন। আমরা তাকে আমাদের সাথে আলজেরিয়া বেড়াতে যাওয়ার দাওয়াত দিলাম। ভেবে দেখবেন বললেন।

***

গির্জার নিজস্ব গাড়ি দিয়েই আমাদের শহরে পৌঁছার ব্যবস্থা করে দিলেন। গাড়িতে ওঠার আগে বললাম :

-আপনার এখানে আশ্রয় নেয়া মুসলমানদের জন্যে কিছু ত্রাণ আনতে চাই! আপনার অনুমতি পেলে হয়।

পাদরি প্রস্তাব শুনে একটু থমকে গেলেন। কিছু বুঝতে না দিয়েই সহাস্যে সম্মতি দিলেন। বোটে ফিরেই পরামর্শ করতে বসে গেলাম। গির্জায় আশ্রয় নেয়া মানুষগুলোর জন্যে কী কী নেয়া যায়? আর গির্জায় থাকা নানদের জন্যেও কিছু নেয়া দরকার। আমরা সাথে করে অনেক নোসখা কুরআন শরীফ নিয়ে এসেছিলাম। বসনিয়ান ভাষায় লেখা কিছু ধর্মীয় বইও সংগ্রহ করেছি। ত্রাণের সাথে সাথে সেগুলোও বিতরিত হয়েছে। কিন্তু গির্জায় এসব দিতে গেলে খুনোখুনি হয়ে যাবে! শেষে সিদ্ধান্ত হলো আমরা ঈসা আ. এবং মারয়ামের ওপর লিখিত বেশ কিছু বই নিয়ে এসেছিলাম। আমাদের পরিকল্পনায় এটা ছিল না। আসার আগের দিন এক বোন জানিয়েছিল, ওখানকার যে পরিস্থিতি তাতে 'ঈসা ও মারয়াম' সম্পর্কিত কিছু বই নিয়ে যাও। ইংরেজি ভাষাতে হলেও হবে। সেটা এখন কাজে লাগবে।

***

আমাদের সাথে টাকা ছিল পর্যাপ্ত। মার্কেটে গিয়ে নানদের জন্যে স্কার্ফ কিনলাম একটা করে। পাদরির জন্যে সুন্দর দেখে একটা ক্রুশ! দামি একটা গাউন! বৃদ্ধার জন্যে সুন্দর দেখে একটা শাল। বিশেষ একজন নানের জন্যে বাড়তি একটা কোট।

-বিশেষ নান?

-বিশেষ নানের কথা আগে বলা হয়নি। আমরা গির্জা থেকে ফিরে এলাম। বোটে ওঠার পর, জামা বদলাতে গিয়ে পকেটে হাত দিয়ে দেখি, একটা চিরকুট।

-একটু কথা বলতে চাই!

ব্যস এটুকুই লেখা! আর কোনো তথ্য নেই। তখনই ভাবলাম, আবার যেতে হবে গির্জায়। যে কোনো ছুতোয়! কী কথা আমার সনে, না শুনে স্বস্তি পাব না। হয়তো কোনো বিপদে আছে, সাহায্যপ্রার্থী হবে!

***

দুদিন পর বিকেলে আমরা একটা গাড়ি ভাড়া করে গির্জায় গেলাম। সবাই উপহার পেয়ে বেজায় খুশি। পাদরি সাহেবের মুখটা কেন যেন বেজার! অবশ্য গাউন পেয়ে মুখে হাসি আর ধরে না। বুড়িও শালটা বার বার নাড়াচাড়া করে গায়ে জড়িয়ে দেখতে লাগল। বোঝা গেল তার বেশ পছন্দ হয়েছে। উদ্বাস্তুদের ত্রাণের প্যাকেটের মধ্যে এক জিলদ করে কুরআন কারীমও দিয়েছি। মনে হয়েছে আর যা-ই হোক, কুরআন কারীম সাথে থাকলে, তাদের কেউ ধর্মান্তর করতে পারবে না। তারাও মনে বল পাবে। কুরআন সাথে রেখে ধর্মান্তরিত হতে লজ্জা পাবে। বাস্তবে হলোও তা-ই! আমাদের কাছে প্রস্তাব দিল, তাদের অন্য উদ্বাস্তুদের কাছে পৌঁছে দিতে। পাদরি সাহেব ভোঁতামুখে রাজি হলেন। মনে মনে শুকরিয়া আদায় করলাম। যাক, বড় গাড়ি নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হয়েছে। শত ব্যস্ততার মধ্যেও চোখ কিছু একটার খোঁজ পেতে তৃষিত হয়ে চারদিকে তাকাচ্ছিল। কিন্তু কিছুই হলো না। কেউ এসে কথা বলল না। কারও সাথে বিশেষ চোখাচোখিও হলো না। এখন উপায়? মাথায় ঝিলিক দিল, আগের বার যেমন পকেটে চিরকুট রাখতে দেখিনি, এবারও তাই হয়নি তো? পকেট হাতড়ে দেখি, ধারণা সত্যি! আশ্চর্য তো? এ যে দেখি দক্ষ পকেটমারকেও হার মানাবে! কোন ফাঁকে পকেটে চালান করল? টেরটিও পেলাম না?

***

সবাইকে আড়াল করে চিরকুটটা পড়লাম। একটা ঠিকানা লেখা। পরদিন বিকেল চারটা সময় দেয়া আছে। ফাঁদ কি না মনে সন্দেহ দেখা দিল। ধুর! সব ঝেড়ে পরদিন গন্তব্যে পা বাড়ালাম। ঠিকানাটা একটা আবাসিক

এলাকার। মিলিয়ে একটা সুন্দর বাসার সামনে দাঁড়ালাম। দরজা খুলে দিল স্বয়ং সেদিনের দুজনের একজন। ভিন্নরূপে। অন্য সাজে! মুচকি হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা জানাল! একজন পুরুষ আর আরেকজন মহিলাও এলেন। বড় আন্তরিক ভঙ্গিতে অভ্যর্থনা জানালেন। মনে জমে থাকা দুশ্চিন্তার কালো মেঘ কেটে গেল। কথা শুরু হলো। যা শুনলাম, কল্পনাতেও আসেনি, এমনটা হবে।

***

আমি যে বাসায় গিয়েছিলাম সেটা ছিল পিলেজা মানে নানের খালার বাড়ি। পিলেজার মা মারা গিয়েছেন। ছেলেবেলায়। খালাই বোনঝিকে মানুষ করেছেন। আমাকে নাস্তা দিয়ে খালা কথা শুরু করলেন :

–আমরা ছিলাম এক মায়ের পেটের দুই বোন। আম্মা ছিলেন জন্মসূত্রে মুসলিম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগে, বলকান অঞ্চলে ব্যাপকভাবে মুসলিম নিধন শুরু হলে, অনেকেই দেশত্যাগে বাধ্য হয়। যারা থেকে গিয়েছিল, তাদের জোরপূর্বক খ্রিষ্টান বানানো হয়েছিল। যুবতীদের ধরে ধরে খ্রিষ্টান পাত্রের কাছে বিয়ে দেয়া হচ্ছিল। আম্মা ছিলেন সেই হতভাগিনীদের একজন। আব্বা ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান খ্রিষ্টান। মাকেও বাধ্য হয়ে খ্রিষ্টধর্ম পালন করতে হয়েছে। আব্বা মনে করতেন, একজন বিধর্মীকে খ্রিষ্টান বানিয়ে বিয়ে করে অনেক বড় পুণ্যের কাজ করেছেন। এ নিয়ে তার পরিতোষের সীমা ছিল না। আম্মা প্রকাশ্যে খ্রিষ্টধর্ম পালন করলেও আব্বুকে লুকিয়ে নামায পড়তেন। আমাদেরও শেখাতে চাইতেন। পিলেজার আম্মু খুবই মনোযোগ দিয়ে নামায শিখতেন। আমি অলসতা করে শিখতে চাইতাম না। আম্মু গোপনে কুরআন তিলাওয়াত শেখাতেন। আব্বু বোধহয় কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাই বড় আপুকে গির্জায় পাঠিয়ে দিলেন। নান হওয়ার জন্যে। আপুর ইচ্ছে ছিল একজন মুসলিম ছেলেকে বিয়ে করবেন। পূরণ হলো না। আম্মুও মনে মনে তা-ই কামনা করতেন।

***

আপু অনেক কষ্টে আব্বুকে রাজি করালেন। তাকে গির্জা থেকে ছাড়িয়ে আনার জন্যে। আব্বু শর্ত দিলেন, তার পছন্দমতো পাত্রকে বিয়ে করতে হবে। আপু মেনে নিলেন। আসলে তিনি যেকোনো মূল্যে গির্জা থেকে বের হতে চাচ্ছিলেন। গির্জা কর্তৃপক্ষ বেঁকে বসল! বলল, কোনো যৌক্তিক

কারণ ছাড়া মেয়েকে তারা ছাড়বে না। আব্বু দায়িত্বশীল খ্রিষ্টান হয়ে কীভাবে এমন কাজ করতে পারেন! যাক, অনেক বলেকয়ে কোনোরকমে নিয়ে এলেন। তবে গির্জা কর্তৃপক্ষ এমনি এমনি ছাড়ল না। তারা একটা কাগজে সই করিয়ে নিল, মেয়ের বিয়ের পর তার সন্তানদের একজনকে গির্জার সেবায় নিয়োগ দিতে হবে। গির্জার এমন টালবাহানায় আব্বুও মনে মনে রেগে গেলেন। কিন্তু করার কিছুই ছিল না। পরিস্থিতিটাই এমন যে মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই। তারা জানত, আম্মু একজন মুসলিম ছিলেন। তাই তাদের সন্দেহ ছিল, ঘরে বোধহয় এখনো ইসলামের চর্চা হয়। পরিবারের একজন নান হলে, দোষ কাটা যাবে।

***

চুক্তি অনুযায়ী পিলেজাকে গির্জায় পাঠিয়ে দিতে হলো। সেই থেকে ও গির্জায় আছে। তার আম্মু মারা যাওয়ার কিছুকাল পরে তার বাবাও মারা গেছেন। গির্জা কর্তৃপক্ষ আরও শক্ত যুক্তি পেয়ে গেছে। বড় আপু মারা যাওয়ার আগে, আমাকে একটা চিঠি দিয়ে গেছে। পিলেজা বড় হলে যেন তাকে দিই। চিঠিতে ওর মা তাকে অনুরোধ করেছে, সে যেন সম্ভব হলে একজন মুসলিম ছেলেকে বিয়ে করে। গির্জা থেকে পালিয়ে হলেও। চিঠিটা পড়ার পর থেকেই সে উন্মনা। আগে সে একজন খাঁটি নিষ্ঠাবান নান হওয়ারই স্বপ্ন দেখত। পেছনের ইতিহাস জানার পর, তার মধ্যে আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। তুমি বাবা কোনো সাহায্য করতে পারবে?

-অবশ্যই পারব! ইনশা আল্লাহ। আমাকে একটু ভাবতে দিন। কীভাবে কী করা যায়, চিন্তা করে দেখি!

-পিলেজা কিন্তু সব সময় ছুটি পায় না। সপ্তাহে একবার ছুটি নিয়ে আমার কাছে আসতে পারে। অথবা গির্জার কোনো কাজে শহরে এলে দেখা করে যেতে পারে।

-ঠিক আছে! আমি আগামীকাল এই সময়ে এসে জানাব!

***

বাসা থেকে চলে এলাম। মাথায় চিন্তার তোলপাড় শুরু হয়েছে। বোটে ফিরে দুই ভাইয়ের সাথে পরামর্শ করলাম। তারা বুঝে শুনে এগুতে বলল। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে আরও একটা বোট আসবে। অতিরিক্ত ত্রাণ নিয়ে। তার মানে আমরা আরও কিছু দিন এখানে থাকতে পারব। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলাম। সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার তাওফীক কামনা করলাম।

পরদিন সময়মতো হাজির হলাম। খালা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। খালুজি আজ ছিলেন না। তিনি খ্রিষ্টান হলেও ধর্মকর্ম পালনে এতটা আগ্রহী নন। মুসলমানদের প্রতি দুর্বলতা আছে। তার পূর্বপুরুষও নাকি মুসলমানই ছিল।

-কী ভাবলে বাছা!

-পিলেজা কি আমাদের সাথে চলে যেতে পারবে?

-কোথায় যাবে? কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানা ছাড়া এভাবে ছেড়ে দেয়াটা কি ঠিক হবে? এই ব্যাপারে ও যা বলবে, তা-ই হবে। আগামীকাল সে আসবে বলে গেছে। তুমি পারলে একটু এসো! তার সাথে কথা বলে ঠিক করা যাবে!

***

তৃতীয় বারের মতো বৈঠক শুরু হলো। আজ খালুজিও ছিলেন। তিনি প্রথম দিন চুপচাপ থাকলেও, আজ তিনিই অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেন। আগে বেড়ে কথা বললেন। মতামত দিলেন। আমাকে বিভিন্ন দিক বুঝিয়ে বললেন। আমি দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে বললাম, পিলেজার যদি আপত্তি না থাকে, আমি তাকে বিয়ে করতে রাজি! আমার কথাটা শুনে পিলেজা খালাকে ধরে কাঁদতে শুরু করে দিল। মায়ের কথা মনে করেই হয়তোবা। আমি ওর সাথে একটু কথা বলতে চাইলাম। সুযোগ দেয়া হলো। খালাকে বসতে বললাম। তিনিও সাথে থাকলেন। আমি নিশ্চিত হয়ে নিতে চাচ্ছিলাম, এটা ওর আবেগপ্রসূত সিদ্ধান্ত কি না। ইসলামধর্ম সম্পর্কে ওর পরিপূর্ণ ধারণা আছে কি না। পর্দা মেনে চলতে কোনো অসুবিধে হবে কি না। পিলেজা প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর সুন্দর করে গুছিয়ে দিল। আমাকে কি শুধু উদ্ধারকর্তা হিশেবেই গ্রহণ করছে, নাকি সজ্ঞানে স্বামী হিশেবে সেটাও জেনে নিলাম। পরদিন দু-ভাইসহ গিয়ে গোপনে বিয়ে করে ফেললাম। খালুজি বিশেষ অনুষ্ঠানের কথা বলে, ফাদার থেকে পিলেজার জন্যে ছুটি নিলেন। দুদিন কোন ফাঁকে উড়ে গেল। খালার বাসাতেই থেকেছি। দু-ভাইকেও খালু যেতে দেননি। তৃতীয় দিন পিলেজাকে বিদায় দিতেই হলো। ওর সে কী কান্না! মূর্ছা যাওয়ার মতো অবস্থা। ও কেন যেন ভয় পাচ্ছিল। তাকে প্রবোধ দিলাম। আর অল্প ক'টা দিন সবুর করো! সব ঠিক হয়ে যাবে! দু-দিনে যতটুকু পারলাম তাকে নামায শেখালাম। সূরা-কেরাত শেখালাম। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা দিলাম। ঘর-সংসার করে স্বামীগিরি করার পাশাপাশি গুরুগিরিও করলাম! ও বেশ

ভালো ছাত্রী। যেকোনো বিষয় খুবই তাড়াতাড়ি ধরে ফেলতে পারে! পিলেজা চলে গেল।

***

এদিকে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ নিয়ে সমস্যা দানা বাঁধতে শুরু করল। খ্রিষ্টান যুবকের দল আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনল, আমরা তলে তলে ইসলাম প্রচার করছি। বিষয়টা ক্রমেই বড় আকার ধারণ করল। খালুজি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। একবার বলেই ফেললেন :

-তোমাদের খুব শীঘ্র শহর ছাড়তে হতে পারে।

সেটা আমিও বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু সেটা যে এত শিগগির, সেটা কল্পনা করতে পারিনি। বিকেলে খালুজি গোপনসূত্রে খবর পেলেন, খ্রিষ্টান যুবকেরা গভীর রাতে আমাদের বোটে আগুন লাগিয়ে দেবে। পরে সুযোগ বুঝে আমাদেরও পাকড়াও করবে। তিনি পরামর্শ দিলেন :

-বাছারা, আমার মনে হয়, তোমরা আপাতত কার্যক্রম স্থগিত করে ফিরে যাও! পরিস্থিতি শান্ত হলে আবার এসো!

খালার মুখ শুকিয়ে এতটুকুন হয়ে গেলেও তিনি স্বামীর কথায় সায় না দিয়ে পারলেন না। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। ফাতেমা (পিলেজ)-এর সাথে শেষ দেখাও কি হবে না? কোনো সম্ভাবনাই যে দেখছি না। বোটের ক্যাপ্টেন বললেন :

-আপাতত সরে পড়াই ভালো হবে! বেঁচে থাকলে দেখা হবেই!

কী আর করা, বাধ্য হয়ে নোঙর তোলার অনুমতি দিতে হলো। খালা-খালু বিদায় দিতে এলেন। খালা ডুকরে কেঁদে উঠলেন। আমার ভেতরটা জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু কী করব!

***

আলজেরিয়াতে ফিরে সপ্তাহ খানেক ঠিকমতো ঘুম হলো না। খাওয়া মুখে রুচল না। খালার ঠিকানায় চিঠি লিখলাম। ফোন করার কোনো উপায় ছিলো না। পত্র-পত্রিকার খবর অনুযায়ী পরিস্থিতি ভীষণ শোচনীয়! সার্বরা শহরের পর শহর জ্বালিয়ে দিচ্ছে। মুসলমান পেলেই ব্রাশ ফায়ার করে উড়িয়ে দিচ্ছে। জীবন্ত কবর দিয়ে ফেলছে। বিশ্বের পরাশক্তিগুলো নীরব! আরব দেশগুলোও নির্বাক! আরব-আমিরাত তো উল্টো সার্বিয়াকে মোটা অঙ্কের সাহায্য দিয়েছে! মনটা ভেঙে গেল। কয়েক বার একা একা ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করলাম। সবাই হা হা করে বাধা দিল। কতভাবে

চেষ্টা করলাম যোগাযোগ করতে, কোনো ফলোদয় হলো না। দিন থেকে থাকে না। বলকান অঞ্চলের যুদ্ধ ও সার্বিক অবস্থার খোঁজ রাখাই আমার প্রধান কাজে পরিণত হলো। পরিবারের চাপে একটা চাকরিও জুটিয়ে নিলাম। পড়াশোনা শেষ করার পর, পরিবার থেকে বিয়ের চেষ্টা চালাল। শক্তভাবে অনীহা প্রকাশ করলাম। তারা আরও কিছুদিন চেষ্টা করে শেষে ক্ষান্ত দিল। আমিও আমার মতো করে বাঁচতে শুরু করলাম।

***

একে একে পাঁচটা বছর কেটে গেল। নিজের দেশ হলে না হয় যেকোনোভাবে যাওয়ার রাস্তা বের করে ফেলা যায়। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিনদেশে, বৈরী পরিবেশে ইচ্ছে হলেই চট করে চলে যাওয়া যায় না। আগের বার জলপথে গিয়েছিলাম, নিজস্ব ভাড়া করা বোটে! এবার জলপথে যাওয়ার রাস্তা নেই। যেতে হলে পাসপোর্ট-ভিসা করে যেতে হবে। সেটা যুদ্ধের ডামাডোলে সম্ভব নয়। আমার সরকারই যেতে দেবে না। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর, একদিন পত্রিকায় দেখি, মন্টিনিগ্রো স্বাধীনতা অর্জন করেছে। ততদিনে দশ বছরেরও বেশি সময় পার হয়ে গেছে। মনটা আশা-নিরাশায় দুলে উঠল। নতুন করে চেষ্টা শুরু করলাম। আলজেরিয়া থেকে সরাসরি ভিসা পাওয়া যাবে না। তাই প্রথমেই প্যারিস গেলাম। সেখান থেকে ভিসা পাওয়া গেল। কীভাবে 'বার' শহরে পৌঁছলাম, বলতে পারব না। ছুটে গেলাম খালার বাসায়। তারা বাসা বদল করেছেন। কয়েক দিনের চেষ্টায় ঠিকানা উদ্ধার হলো। দেরি না করে উড়ে গেলাম। দরজা খুলে খালা আমাকে দেখে স্থাণু হয়ে গেলেন। ঝর ঝর করে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বললেন :

-বড্ড দেরি হয়ে গেছে রে!

আমার মাথা ঘুরে গেল। চক্কর দিয়ে পড়ে গেলাম। ধরাধরি করে মাথায় পানি ঢালা হলো। হুঁশ ফিরে পেতেই বুক ভেঙে কান্না এল। একটু সুস্থ হয়ে খালার কাছে সব শোনার জন্যে মনকে শক্ত করে নিলাম।

-এবার বলুন খালা, কী হয়েছিল?

-তোমরা চলে যাওয়ার পর, পুরো শহরজুড়ে ভীষণ তোলপাড় শুরু হয়। তোমরা গোপন খবর কীভাবে জানতে পারলে এটা নিয়ে কানাঘুষা শুরু হলো। তোমার খালুর ওপর গিয়ে পড়ল সবার সন্দেহের আঙুল! বেয়াড়া যুবকেরা ধরে নিয়ে গেল তোমার খালুকে। আধমরা করে ছেড়ে দিল। বেচারা বেশিদিন এর ধকল সইতে পারেননি। তারপর এল পিলেজের

পালা। গির্জায় গোপনে নামায পড়তে গিয়ে সেও ধরা পড়ে গেল। শুরু হলো ভয়ংকর নির্মম এক অধ্যায়। কিছুদিন পর ধরা পড়ল, সে সন্তানসম্ভবা। ভিমরুলের চাকে ঢিল পড়ল যেন। শেষে আমাকে নিয়ে পর্যন্ত টানাটানি শুরু হলো। আমার মতো বুড়িকেও তারা মারতে বাকি রাখেনি।

***

পিলেজা শত নির্যাতনেও মাথা নত করেনি। মাত্র দু-দিনে তাকে কী এমন শিক্ষা দিয়ে গেলে জানি না। সে কিছুতেই ইসলাম ছাড়তে রাজি হয়নি। গির্জা কর্তৃপক্ষ তাকে বন্দী করে রেখেছিল। সন্তান প্রসব হওয়ার অপেক্ষায় ছিল। সন্তান হওয়ার পর নবজাতককে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। তখনো তোমার খালু বেঁচে আছেন। তিনি প্রভাব খাটিয়ে বাচ্চাটাকে আমাদের কাছে নিয়ে আসতে সক্ষম হন। কিন্তু পিলেজাকে কিছুতেই ছাড়াতে পারলেন না। আমি ছোট্ট মারয়ামকে বুকে নিয়ে নতুন করে বাঁচার আনন্দ পেলাম। আমার কোনো সন্তান নেই। পিলেজাকেই আমার সন্তান মনে করে এসেছি।

-মেয়ের নাম বুঝি মারয়াম?

-হ্যাঁ, পিলেজাই পছন্দ করে রেখেছে।

-পিলেজা এখন কোথায়?

-সন্তান হওয়ার পর, গির্জা কর্তৃপক্ষ তাকে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করার জন্যে মারাত্মক রকমের চাপ প্রয়োগ করতে শুরু করল। দিন দিন নির্যাতনের মাত্রা বেড়েই চলছিল। একটা মানুষ কতটা সহ্য করতে পারে? খাওয়া নেই, পানি নেই। আল্লাহ দয়া করে তাকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। তার লাশটা ফেরত দিতেও তাদের গড়িমসি। তবে এটুকু সান্ত্বনা তার কাফন-দাফন ইসলামী মতেই হয়েছে।

-কোথায় তার কবর?

-চলো দেখিয়ে দিই।

-আর মারয়াম?

-ওকে এক অজ্ঞাত স্থানে পাঠিয়ে দিয়েছি। এখানে রটিয়ে গিয়েছি, সেও মারা গেছে। এবার চলো তোমার সন্তান তোমাকে বুঝিয়ে দিই। তুমি তাকে নিজের দেশে নিয়ে গিয়ে মনের মতো করে গড়ে তুলতে পারবে।
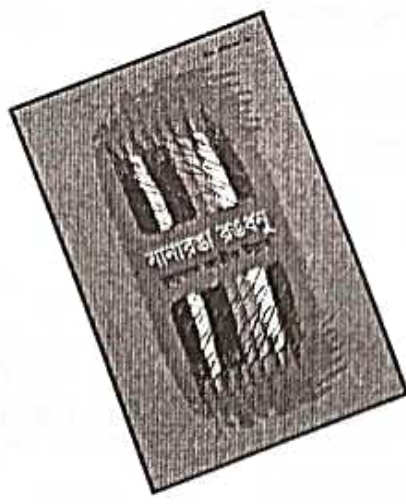
জীবন জাগার গল্প : ৬২০

স্বর্ণকেশী নীলনয়না

-১-

দুজন হাঁটছে। একজন ছোট। একজন বড়। দেখলেই বোঝা যায়, মা-মেয়ে। ভিড়ের মধ্যেও দুজনকে আলাদা করে চোখে পড়ছিল। কুদসের রাস্তায় অহরহ বিদেশিনীর দেখা মেলে। কিন্তু এমন গাঢ় নীলনয়না খুব একটা দেখা যায় না। বিভিন্ন দেশ থেকে ইহুদীরা এখানে এলেও, স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলো থেকে এসেছে, এমন অভিবাসীর সংখ্যা নেই বললেই চলে। গুটিকয়েক হয়তো খুঁজলে পাওয়া যাবে। কারণ, ওদিকে ইহুদীরা খুব একটা পা বাড়ায়নি। হাতে-গোনা কিছু ওদিকটাতে গেলেও পরের দিকে গিয়েছে। বড় জনের হাতে একটা টেলিফোন নম্বর লেখা চিরকুট। একটা দোকানে নিয়ে চিরকুটটা দেখাল। দোকানি টেলিফোন সেটটা এগিয়ে দিল। ডায়াল করে দেখা গেল সংযোগ বিচ্ছিন্ন। এখন এক্সচেঞ্জ অফিসে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। অফিসে যাওয়ার পর দেখা গেল ওটা পশ্চিম তিরের নম্বর। ঠিকানা নিয়ে নির্দিষ্ট বাড়িতে নক করল। দরজা খুলল এক মধ্য-পঞ্চাশের মহিলা।

***

–আপনারা?

–আমি ক্রিস্টিনা! আর এ আমার মেয়ে 'বাহজা'। এই নম্বরটা তো আপনাদের তাই না?

–জি ছিল। এখন আর সংযোগ নেই। মোবাইল আসার পর আর প্রয়োজন পড়ে না। নম্বরটা আপনি কোথায় পেয়েছেন?

–সে অনেক কথা। আমি ডেনমার্ক থেকে এসেছি। গাযার জন্যে রিলিফ নিয়ে আসা দলের সাথে।

–কর্তৃপক্ষ ভিড়তে দিয়েছে?

–আমাদের সাথে দুজন ডেনিশ সংসদ সদস্য আছে। ইসরায়েল তাদের এড়াতে পারেনি। এমনিতে তুর্কি জাহাজ আক্রমণ করে তারা একটু বেকায়দায় আছে। আর ডেনমার্ক থেকে ইসরায়েলে অনেক অর্থ-সাহায্য আসে। আমাদের জাহাজ 'পাইথন' তিরে ভেড়ার অনুমতি পেয়েছে। তাও কঠোর ইসরায়েলি সেনাপ্রহরায়।

–আসল কথাই ভুলে গেছি! তুমি কি নম্বরটা উসমানের কাছে পেয়েছ?

–উসমান? ও অটোমান! জি। তার কাছ থেকেই নেয়া।

–আচ্ছা আচ্ছা, আমি কী বোকা! তুমি তা হলে...!

–জি, ঠিক ধরেছেন। আমি উসমানের স্ত্রী। আর এই খুকি আমাদের মেয়ে। উসমান এই নম্বরে ফোন করে তার মায়ের সাথে কথা বলত! আমিও অনেক বার বলেছি। যদিও আমরা দুজনেই দুজনের কথা বুঝতাম না। মাঝেমধ্যে উসমান দু-পক্ষকে বুঝিয়ে দিত।

–সে অনেক আগের কথা! শুনেছি তোমাদের মাঝে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

–নাহ। তেমন কিছু হয়নি। আপনার পরিচয়টা, মানে আমি কি আপনার সাথেই কথা বলতাম ফোনে?

–না। আমার বোনের সাথে কথা বলতে। আমিও কয়েক বার কথা বলেছিলাম! তোমাকে দেখার কত শখ ছিল! জানতাম এ কখনো পূরণ হবার নয়। অসম্ভব। কিন্তু কী আশ্চর্য! দেখা হয়ে গেল।

–আপনি তা হলে উসমানের খালা। আপনার নাম 'আসমা'?

–তাও মনে রেখেছ! কী যে ভালো লাগছে তোমাকে পেয়ে। আমার এই টুকটুকে নাতনিটাকে পেয়ে। চলো তোমাকে আর দেরি করাব না। আসল জনের কাছে নিয়ে যাই।

–ওনার বাসাটা এখান থেকে কদ্দূর?

–এই তো বেশি দূরে নয়। উসমান ফোন করলে আপুকে খবর দিতাম। উনি নির্দিষ্ট সময়ে এসে ফোনের অপেক্ষা করতেন। তুমি তো এসব জানোই।

–জি চলুন। চলো 'বাহজা'! দাদুর কাছে।

***

পেছন ফিরে দেখা।

গির্জার ঘণ্টাটা ঝড়ো বাতাসে দুলছে। ঢং ঢং শব্দ হচ্ছে। মূল হলঘরে এক যুবক হাত চালিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। টেবিল-চেয়ারগুলো গুছিয়ে রাখছে। কেউ কিছু ফেলে গেল কি না অনুসন্ধান করে দেখছে। প্রায়ই এমন হয়। বিশেষ করে মহিলারা এটা সেটা ফেলে যায়। সেটা ঠিকানামতো পৌঁছে দিয়ে আসতে হয়। একটু আগেই প্রার্থনা-সভা শেষ হয়েছে। আগত পুণ্যার্থীরা যে যার ডেরায় ফিরে গেছে। আবার এক সপ্তাহের জন্যে গির্জা বন্ধ হয়ে থাকবে। কেউ এদিকের ছায়াও মাড়াবে না। প্রার্থনা না হলেও পরিচ্ছন্নতার কাজ থেমে থাকে না। বেতনধারী কর্মচারীরাই সব কাজ করে। ফাদারও সব সময় থাকেন না। ডেনমার্কে বেশির ভাগ খ্রিষ্টানই 'লুথারিয়ান চার্চ'-এর অনুসারী। ক্যাথলিকদের মতো তারা এতটা যাজকনির্ভর নয়। অন্ধ বা কট্টর নয়।

***

কোপেনহেগেনের একটা লুথারিয়ান চার্চের চাকরি নিয়ে এখানে এসেছে মুরাবিত উসমান। পাসপোর্টে অবশ্য তার নাম আবরাহাম খলিল। কাউকে নিজের নাম বলার সময় সে 'মুরাবিত উসমান' বলেই পরিচয় দেয়। বাড়ি ফিলিস্তিন হলেও সে মূলত লেবানিজ পাসপোর্ট বহন করে। মা আগে গাযাতে থাকলেও এখন থাকেন পশ্চিম তিরে। বাবা-ভাই-বোন কেউ বেঁচে নেই। মায়ের সাথে ফোনে যোগাযোগ হয়। তাও মাঝেমধ্যে। সব সময় লাইন পাওয়া যায় না। নানাজনের ভায়ায় মায়ের জন্যে টাকা পাঠানো যায়। মায়ের সাথে আজ অনেকদিন দেখা নেই। কিশোর বয়েসে ইসরায়েলি সেনাদের ধাওয়া খেয়ে, টানেল-বর্ডার ক্রস করেছিল। সোজা গিয়ে উঠেছিল দামেস্কের 'মুখাইয়াম ইয়ারমুকে'। সেখান থেকে এক এনজিওর মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়েছিল লেবাননের এক স্কুলে। খ্রিষ্টানদের পরিচালিত আধা-ধর্মীয় শিক্ষালয়। আর কষ্ট করতে হয়নি। এদের তত্ত্বাবধানেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পার হয়েছে।

***

পড়াশোনা শেষ করার পর, স্কুলের প্রধান শিক্ষক ফাদার নিজে উদ্যোগী হয়ে ডেনমার্কে পাঠিয়েছেন। বিশেষ এক কোটায়। উসমানের প্রতি বাড়তি স্নেহবশতই তিনি এমনটা করেছিলেন। তার ধারণা ছিল, উসমান একজন

ভালো খ্রিষ্টান হিশেবে ডেনিশ গির্জায় কাজ করবে। ওখানকার লুথারিয়ানদের মধ্যে মেরোনাইট খ্রিষ্টানদের আদর্শকে কার্যকরভাবে তুলে ধরবে। গির্জার ফাদার তার শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখে, যথাযথ কদর করলেন। অফিসের কাজে নিয়োগ দিলেন। পাশাপাশি প্রার্থনা-সভা দেখভালের দায়িত্ব দিলেন। আজো উসমান তা-ই করছিল। সভাশেষে আবার একবার চক্কর দিয়ে শেষবারের মতো দেখে নিচ্ছিল, কেউ কিছু ফেলে গেল কি না। পুরো হলঘর দেখা শেষ করে বের হয়ে আসার সময় দেখল একটা ভ্যানিটি ব্যাগ পড়ে আছে। ভেতরে মেয়েলি জিনিসপত্রের পাশাপাশি বেশ কিছু টাকা। একটা বহুমূল্য হীরের আংটি। মোবাইলটাও রয়ে গেছে। আচ্ছা ভুলোমনা মেয়ে দেখছি!

***

উসমান ঠিকানা উদ্ধার করে ব্যাগ পৌঁছে দিতে গেল। কলিংবেল টিপতেই এক স্বর্ণকেশী বেরিয়ে এল।

–আচ্ছা! আমি আরও যাব বলে ভাবছিলাম।

–বুঝে নিন! সব ঠিকঠাক আছে কি না!

–না থাকলেও কোনো সমস্যা নেই। আপনার কি সময় হবে। এক কাপ কফি?

–জি, চলতে পারে। আমার অত তাড়া নেই। আসলে আমার একটা কৌতূহল আছে! সেটা প্রকাশ করা ঠিক হচ্ছে না। তবুও যদি আপনি কিছু মনে না করেন, প্রকাশ করতে পারি!

–কোনো সমস্যা নেই। নির্ভয়ে বলুন।

–এ পর্যন্ত আপনার বয়সের কাউকে চার্চে যেতে দেখিনি। আপনি কেন গেলেন? আর আপনার বয়েসী কেউ ভ্যানিটি ব্যাগ ভুলে রেখে আসবে, এটাও স্বাভাবিক বিষয় নয়।

–বিশেষ কারণে আমার মনটা ভীষণ খারাপ ছিল। ভাবলাম চার্চে গেলে মনটা ভালো হবে। কিন্তু সেখানে গিয়ে কোনো লাভ হলো না। উল্টো আরও কষ্ট বেড়ে গেল। অন্যমনস্ক থাকায়, আসার সময় ব্যাগের কথা মনেই ছিল না।

***

দুজনের আকস্মিক সাক্ষাৎ আস্তে আস্তে স্থায়ী রূপ নিল। উসমান গির্জার চাকরিটা ছেড়ে দিল। যেহেতু ডেনমার্কেই স্থায়ীভাবে থেকে যাওয়ার ইচ্ছে, তাই বিয়েটাও এখানেই করে ফেলার কথা ভাবতে শুরু করল। ক্রিস্টিনাকে সেটা জানাল। সে এত তাড়াতাড়ি বিয়ের কথায় অবাক হলেও সানন্দেই রাজি হলো। তখন উসমান একটা প্রস্তাব দিল।

–যদি কিছু মনে না করো, আমাদের বিয়েটা কি 'ইসলামিক সিস্টেমে' হতে পারে?

–তুমি না খ্রিস্টান?

–চার্চে ছিলাম। এই হিশেবে আমাকে তুমি খ্রিষ্টানই বলতে পার। আমি ছেলেবেলা থেকে গির্জার অধীনে মানুষ হয়েছি। কিন্তু আমার জন্ম খ্রিষ্টান পরিবারে হয়নি।

–তোমার ছেলেবেলা সম্পর্কে আমাকে তুমি কখনো কিছু বলোনি। প্রশ্ন করার পরও এড়িয়ে গেছ। এখন কি বলতে পারবে?

–আমার মূল বাড়ি ফিলিস্তিনে। আমার বাবা ও দুই ভাই ইসরায়েলি সেনাদের হাতে শহীদ হয়েছেন। আমাকেও তারা ধরতে এসেছিল। আমি একদম ছোটবেলাতেই কয়েকজন লোকের সাথে সিরিয়া পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলাম। তারপরের ঘটনা অনেক লম্বা। মোটামুটি অনেকটাই তোমাকে বলেছি। আমার মা এখনো বেঁচে আছেন। বাড়ি থেকে বের হওয়ার দীর্ঘদিন পর আমি মায়ের সাথে কথা বলতে পেরেছিলাম। দীর্ঘ দশ বছর পর। গির্জা কর্তৃপক্ষকে জানতে দিইনি আমার মা বেঁচে আছেন। অবশ্য আমি নিজেও জানতাম না, তিনি বেঁচে আছেন না মারা গেছেন। খালার বাসার টেলিফোন নম্বরটা মুখস্থ ছিল। ওটাই ছিল আমার একমাত্র যোগসূত্র। আম্মা থাকতেন গাযায়। খালামণি থাকতেন পশ্চিম তিরে। ফাতাহ-শাসিত এলাকায়। এখানে ইসরায়েলের চাপ কম থাকে। তাই বাইরে থেকে যোগাযোগ করা যায়। অনেক ইচ্ছে করলেও, যোগাযোগ করিনি। মাধ্যমিক পরীক্ষার পর আর থাকতে না পেরে মায়ের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম। অনেক কষ্টে। প্রথমে খালামণির সাথে। তারপর তিনি তারিখ দিয়ে বলেছিলেন, সেদিন আম্মুকে গাযা থেকে যে করেই হোক আনিয়ে রাখবেন। আমি যেন নির্দিষ্ট সময়ে ফোনটা অবশ্যই করি। আম্মু আমার আশা একদম ছেড়েই দিয়েছিলেন।

***

আমি একটা খ্রিষ্টান স্কুলে পড়ি। তবুও কখনোই আম্মুকে জানাইনি, আমি মুসলিম পরিবেশে থাকি কীভাবে যেন তিনি আঁচ করে ফেলেছিলেন, তিনি খুশি ছিলেন না। তার ধারণা ছিল না। ডেনমার্কে আসার ব্যাপারেও তিনি খুশি ছিলেন না। তার ধারণা মিথ্যাও ছিল না। আমি আমি পুরোপুরি খ্রিষ্টানই বনে গেছি! তার ধারণা মিথ্যাও ছিল না। আমি ইসলামের কিছুই মানতাম না। চার্চের প্রার্থনা-সভায় অংশ নিতাম। ফাদারের কাজে সাহায্য করতাম। যদিও আমি সেটা করতাম, কর্তব্যের খাতিরে। দায়িত্বের কারণে। আম্মু বুঝতে পেরেছিলেন, আমার ওপর জোর খাটিয়ে তিনি কিছু করতে পারবেন না। তাই একটা অনুরোধ করেছিলেন।

-কী অনুরোধ?

-বিয়েটা যেন আমি মুসলিম ধর্মমত অনুসরণ করেই সম্পন্ন করি। এখন তোমার আপত্তি না থাকলে, সেটা সম্ভব হতে পারে।

-কিন্তু আমি তো খ্রিষ্টান। এবং খ্রিষ্টান হিশেবেই বাঁচতে চাই। তোমাকেও খ্রিষ্টান হিশেবেই চিনেছি ও জেনেছি।

-ক্রিস্টিনা, তুমি কি চিন্তা করার জন্যে সময় নেবে?

-না, সময় নেয়ার প্রয়োজন নেই। কোন পদ্ধতিতে বিয়ে হচ্ছে, সেটা আমার কাছে তেমন কোনো বিষয় নয়। তোমাকে কাছে পাচ্ছি, এটাই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

***

বিয়ের পর দুজনের মধ্যে চমৎকার বোঝাপড়া গড়ে উঠল। প্রাচ্য পরিমিতিবোধ আর পশ্চিমা আগ্রাসী ভালোবাসার সমন্বয়টা দারুণভাবে হলো। কিন্তু প্রথম সমস্যা দেখা দিল ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে। এ মাসের ত্রিশ তারিখে, ডেনমার্কের প্রভাবশালী পত্রিকা *জিলান্ড পোস্টেন* একটা ভয়ংকর কাজ করে বসল। তারা নবীজির কাল্পনিক ব্যঙ্গাত্মক ছবি প্রকাশ করল। সাথে সাথে মুসলিম-বিশ্ব ক্ষোভে-বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। মুসলমানরা উত্তাল হয়ে উঠল। ঘটনার আকস্মিকতায় উসমান কেমন যেন থমকে গেল। স্বামী-স্ত্রী দুজনের কেউই ধর্মপালনে তেমন আগ্রহী নয়। দুজনই সমাজে খ্রিষ্টান হিশেবে পরিচিত। সরকারি নথিতেও তাই। কিন্তু বিশ্বমুসলিম এমনকি ডেনমার্কের মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া দেখে, উসমানের মধ্যে কেমন যেন ভাবান্তর দেখা দিল। সিরিয়ার 'ইয়ারমুক

তাঁবু' ছেড়ে আসার পর থেকে তার সাথে মুসলিম-সমাজের কোনোরকম যোগাযোগ ছিল না বললেই চলে। তার সব সময় ওঠাবসা ছিল খ্রিষ্টানদের সাথেই। প্রাতিষ্ঠানিক ও পারিপার্শ্বিক কারণে।

পত্রিকার কয়েকটা ছবি ছিল খুবই অপমানজনক। একজন প্রেরিত পুরুষের ছবি এভাবে আঁকা সুরুচির পরিচায়ক নয়। প্রতিবাদ সত্ত্বেও পত্রিকা কর্তৃপক্ষ নমনীয় হলো না। ডেনিশ সংসদও এটাকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বলে পাশ কাটাতে চাইল। এতে যেন আগুনে ঘি পড়ল। উত্তাপ কেবল বাইরেই সীমাবদ্ধ থাকল না। দুজনের দাম্পত্যজীবনেও হানা দিল। ক্রিস্টিনের কাছেও বিষয়টা বিসদৃশ ঠেকছিল। হাজার বছর আগে মারা যাওয়া একজন ব্যক্তির ছবি আঁকলে, কীইবা সমস্যা? উসমানও ঠিক বুঝতে পারছিল না, সেও কেন ব্যাপারটাতে এত কষ্ট পাচ্ছে। উত্তেজিত হচ্ছে? এটা মুসলমানদের ব্যাপার! কিন্তু কিছুতেই নিজেকে থামাতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল এটা তাকেই অপমান করা হয়েছে। কোনো যুক্তি ছাড়াই তার ভেতরে এমন চিন্তা কাজ করতে শুরু করেছিল। সে অন্ধভাবেই বলতে শুরু করল :

–এটা মোটেও ঠিক কাজ হয়নি। একজন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিকে ব্যঙ্গ করার মাঝে কী যুক্তি থাকতে পারে?

ক্রিস্টিনা পাল্টা যুক্তি দিল :

-ছবিগুলো তো একটা পাঠ্য বইয়ের জন্যে আঁকা হয়েছে।

-পাঠ্যবইয়ের জন্যে আঁকা হলে, এমন ঘটা করে দৈনিকে ছাপা হবে কেন? আর তুমি কি জানো না, পত্রিকাটা ঘোরতর ডানপন্থী? মালিকপক্ষও কট্টর ডানপন্থী! তারা মুসলমানদের দেখতে পারে না।

-তোমার এই চিন্তা সঠিক নয়। আমরা ডেনিশরা মুক্ত চিন্তা লালন করি। বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশ হলো এই ডেনমার্ক। হিংসা বা কট্টর চিন্তা নিয়ে বুঝি সুখী হওয়া যায়?

-এটা যদি মুক্ত চিন্তার অধিকার হয়, তা হলে আমি যদি ডেনমার্কের রানির 'বিবস্ত্র' ছবি এঁকে রাস্তায় দাঁড়াই! তুমি কীভাবে নেবে?

–তুমি শুধু শুধু কেন তার ছবি আঁকতে যাবে?

-এই তো লাইনে এসেছ! আমি মুক্ত চিন্তার অধিকারে যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারব না। তা হলে *জিলান্ড পোস্টেন* কীভাবে পারবে!

-ও, তুমি তা হলে ভেতরে ভেতরে মুসলিমই ছিলে! কই তোমাকে তো কখনো ওই ধর্মের কোনো আচার পালন করতে দেখিনি? কাগজে-কলমে তুমি একজন খ্রিষ্টানই আছ! এতদিন একসাথে থাকলাম। একটুও টের পেলাম না! আশ্চর্য!

-ব্যাপারটা নিয়ে আমিও কম আশ্চর্য হইনি! নামে খ্রিষ্টান হলেও, আমি নিজেকে কখনোই মনেপ্রাণে খ্রিষ্টান ভাবিনি। আবার আমি মুসলমান কি না, এই প্রশ্নও মাথায় আসেনি। কিন্তু নবীজিকে ব্যঙ্গ করে ছাপা ছবিটা দেখার সাথে সাথে ভেতরে কী এক ওলট-পালট হয়ে গেল! মনে হলো, উনি আমার অতি আপনজন। তার এই অপমানে আমারও অপমান বোধ করা উচিত। তার সম্মান রক্ষায় আমাকেও এগিয়ে আসা উচিত। তাই সেদিন প্রতিবাদ-সভায় যোগ দিয়েছিলাম।

-প্রতিবাদ-সভায় গিয়েছ? আমি একটুও জানতে পারলাম না!

***

নবীজির ছবি ছাপা নিয়ে স্বামী আর স্ত্রীর মতানৈক্য দেখা দিল। ক্রিস্টিনা বিষয়টাতে নীরব ভূমিকা নিলেও, উসমানের অবস্থান দিন দিন আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে লাগল। এটা দেখে ক্রিস্টিনা চিন্তিত হয়ে পড়ল। দুজনের সম্পর্কের মাঝেও কেমন শীতলতা দেখা দিল। উসমান যতই বিষয়টা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হতে লাগল, ক্রিস্টিনা ততটাই গুটিয়ে যেতে লাগল। সে যেন এই উসমানকে চিনতে পারছে না। কেমন শান্তশিষ্ট মানুষটা কী বেপরোয়া হয়ে গেল! শুধু উসমান নয়, আরও অনেক মুসলমানই এ ঘটনার পর থেকে বাড়াবাড়ি করা শুরু করে দিয়েছে। কারও কারও আচরণ বেশ সহিংসও হয়ে উঠছে।

***

যতই দিন গড়াতে থাকল, সারাবিশ্বের সাথে সাথে ডেনমার্কের অভিবাসী মুসলমানরাও বেসামাল হয়ে উঠতে থাকল। এর মধ্যে আরেকটা ঘটনা ঘটল। উসমান যে চার্চে চাকরি করত, সেখানকার প্রধান ফাদার ছবির স্বপক্ষে চার্চে বক্তব্য দিল। নবীজি সম্পর্কে কটাক্ষ করতেও ছাড়ল না। এ নিয়ে এলাকায় অল্প যে কয়েকজন মুসলমান আছে, তারা তীব্র প্রতিবাদ

জানাল। ফাদারের বক্তব্যের ক্লিপ ইউটিউবে ছড়িয়ে পড়ল। উসমান এ ঘটনায় আরও অন্য রকম হয়ে গেল। কয়েক দিন রাতে ঘরেও ফিরে এল না। জিজ্ঞাসা করলেও সদুত্তর দেয়নি। এখন সে নিজেকে মুসলমান বলেই পরিচয় দেয়। ঘরে নামায পড়ে। বাসায় যতক্ষণ থাকে চুপচাপ থাকে। স্ত্রীর সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করে না, আবার উষ্ণ আলিঙ্গনেও জড়ায় না। এভাবে চলতে থাকলে সম্পর্ক টিকবে? ঝগড়া হলেও না হয় কথা ছিল। কিন্তু ঝগড়াও হয় না। কেমন গুমোট একটা পরিস্থিতি। একটা সন্ধিক্ষণের পূর্বাভাস।

***

এভাবে আরও কয়েক দিন গেল। একদিন ক্রিস্টিনা জোর করেই উসমানকে চেপে ধরল। তার এমন গুটিয়ে থাকা আচরণের কারণ জানতে চাইল। উসমান বলল :

-ক্রিস্টিনা, আমি নিজেকে কাগজে-কলমে মুসলমান ঘোষণা করব বলে ঠিক করেছি। তাই একটু চিন্তা-ভাবনায় ব্যস্ত। তোমার দিকে নজর দিতে পারছি না। ঠিকমতো কথাও বলতে পারছি না।

–আচ্ছা, সামান্য কার্টুনের ঘটনার জের এতদূর গড়াবে, আমি কল্পনাও করতে পারিনি।

–তুমি যেটাকে সামান্য মনে করছ, সেটা আমার এবং আমাদের কাছে অসামান্য! মহাদুর্ঘটনা! আর আমার মনের যা অবস্থা, তাতে সামনের দিনগুলোতে কী যে হয়, বুঝতে পারছি না।

–তুমি কেমন যেন হেঁয়ালি করে কথা বলছ। তুমি আগের মতো আর আমাকে ভালোবাসো না! আমি এগিয়ে এসে কথা না বললে, তুমি কথাও বলতে না। একটা সুসংবাদ শোনানোর জন্যেই জোর করে পাকড়েছি।

–সুসংবাদ?

–আমার সময় পেরিয়ে গেছে! কিন্তু 'ইয়ে' হচ্ছে না! সন্দেহ হওয়াতে 'কিট' এনে পরীক্ষা করেছি। পজেটিভ দেখিয়েছে।

–আলহামদু লিল্লাহ!

***

সন্তানের আগমন-সংবাদেও দুজনের মাঝে গড়ে ওঠা দেয়াল ভাঙল না। উসমান চেষ্টা করল, ক্রিস্টিনার সাথে একটা আপসে আসতে। তাকে নিজের মানসিক অস্থিরতাটা ভালোভাবে বুঝিয়ে বলতে। কিন্তু নবীজির প্রতি ডেনমার্কের ডানপন্থীদের অবজ্ঞামূলক অবস্থান অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। ক্রিস্টিনাও যেন ডানপন্থী চিন্তা দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত। এটা আগে দেখা যায়নি। ভাবনার বিষয়।

-২-

মুরাবিত ইদানীং তুমুল ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে। ক্রিস্টিনা তাকে কয়েক বার বলেছে, হাসপাতালে যেতে হবে। কথাও দিয়েছে স্ত্রীকে, নিয়ে যাবে। কিন্তু উসমান এখন বাসায় আসে না বললেই চলে। শেষে বাধ্য হয়ে ক্রিস্টিনা একাই ডাক্তারের কাছে গেল। দুর্বল বোধ হওয়ায়, কয়েক দিনের জন্যে ছুটিও নিল। আশা, যদি উসমানকে দিনের বেলায় পাওয়া যায়। তার সাথে খোলাখুলি আলাপ করবে।

***

হাসপাতাল থেকে ফিরে ক্রিস্টিনা টেবিলের ওপর একটা ভাঁজ করা কাগজ পেল। উসমান হয়তো কিছু লিখে গেছে। সত্যি তা-ই। পুরোটা পড়ে ক্রিস্টিনা নির্বাক হয়ে গেল। মাথাটা শূন্য শূন্য লাগল। যেন সে পৃথিবীতে নেই। কখনো ছিল না। আশেপাশেও কেউ নেই। কোনো জন-প্রাণী নেই। চারদিক খাঁ খাঁ। বাইরে তুষারপাত নেই। সে চিঠিটা আবার পড়ল।

***

ক্রিস্টিন,

আমি চলে গেলাম। তুমি যখন চিঠিটা পড়বে, আমি তখন আকাশে। না না, সরাসরিই বলে যেতাম। কিন্তু তোমার ভালোর জন্যেই বলে গেলাম না। কেন এ কথা বললাম, এখন বুঝতে না পারলেও, দুয়েক দিন পরই বুঝতে পারবে। তোমাকে এই অবস্থায় রেখে যেতে আমার কেমন লাগছে সেটা যদি তোমাকে বোঝাতে পারতাম! শুধু এটুকু বলি, আমি ডেনমার্কে আমার জীবনের সব হাসি-আনন্দ রেখে যাচ্ছি। তোমার কাছে আমি আমার সমস্ত ভালোবাসা রেখে যাচ্ছি। তোমার ভেতরে বেড়ে উঠতে থাকা 'প্রাণ'টাতে আমার সমস্ত স্নেহ-মমতা রেখে যাচ্ছি।

আরেকটা ব্যাপার, তুমি দেখতে পেয়েছ, গত কয়েক মাস ধরে ঘটতে থাকা বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, তোমার আমার মাঝে একটা দেয়াল উঠে গিয়েছিল। এতদিন বুঝতে না পারলেও, নবীজিকে অপমান করে ছবি আঁকার ঘটনার পর পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি—আমি এতদিন একজন মুসলমানই ছিলাম। যতই খ্রিষ্টধর্মের ছায়ায় বেড়ে উঠি। যতই চার্চের কাজে অংশ নিই। ছেলেবেলার ধর্ম আমার ভেতরেই শেকড় গেড়ে বসে ছিল। আমার পেয়ারা নবীর মহব্বত আমার মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত ছিল। ঘটনাটা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্যে অত্যন্ত অপমানজনক হলেও, আমার জন্যে একদিক দিয়ে ভালো হয়েছে। আমি নিজেকে চিনতে পেরেছি। নিজের ভেতরটাকে আবিষ্কার করতে পেরেছি।

ক্রিস্টিন,
তুমি তোমার খ্রিষ্টধর্মের প্রতি অনুরক্ত থাকতে পছন্দ করেছ। এ জন্যেই মূলত আমাদের দুজনের দূরত্ব। ইসলামী বিধানমতে একজন মুসলিম আর অমুসলিম বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। এই বিধানটা জানার পর থেকেই ভীষণভাবে মুষড়ে পড়েছিলাম। তোমাকে ছাড়া আমার জীবন কল্পনা করাই আমার জন্যে অসম্ভব! আবার আমার দ্বীন, আমার রসূলের মর্যাদার সামনে, ভিন্ন কোনো সম্পর্ককে প্রাধান্য দেয়াও ইসলামসম্মত কাজ হতে পারে না। জীবনে হয়তো আর কখনো তোমার সাথে দেখা হবে না। আমার কলিজার টুকরোটার সাথেও না। কথাও হবে না। আমি তোমাকে আজীবন স্মরণ করে যাব। তোমার ভালোবাসার স্মৃতি আগলেই বাকি জীবন পার করে দেব। পৃথিবীতে মা ছাড়া আমার আর কোনো আপন মানুষ ছিল না। মায়ের কাছ থেকে দূরে আছি সেই ছেলেবেলা থেকে। সেই হিশেবে তুমিই ছিলে আমার জীবনের প্রথম 'আপন' মানুষ। তুমি চাইলে আনুষ্ঠানিকভাবে আমাকে ছেড়ে অন্য কাউকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে নিতে পার!

ক্রিস্টিন,
তোমার প্রতি আমার একটা অনুরোধ! তুমি কি ইসলামধর্ম সম্পর্কে একটু খোঁজ-খবর নিয়ে দেখবে? আমাদের পেয়ারা নবীজি সম্পর্কে একটু পড়াশোনা করে দেখবে? আমাদের এতদিনের ভালোবাসার দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি লাভবান হবে।

ক্রিস্টিন,
মেয়ে হলে তার নাম রেখো 'বাহজা'। ছেলে হলে, তুমি পছন্দমতো একটা নাম রেখে দিয়ো। ইসলামকে যদি তোমার পছন্দ নাও হয়,

আমার একটা আবদার থাকবে, আমাদের সন্তানকে 'ইসলাম' চেনার সুযোগ করে দিয়ো। তাকেই তার ধর্ম বেছে নেয়ার সুযোগ দিয়ো। আর তোমার কাছে তোমার খ্রিষ্টধর্মই সেরা মনে হলে 'আমাদের সন্তানকে' অন্তত এটুকু বোলো,

তোমার আব্বু ভালো মানুষ ছিলেন। মুসলমান ছিলেন। তিনি কখনো জেনেশুনে কোনো খারাপ কাজ করেননি। -ভালো থেকো।

***

ক্রিস্টিনা চিঠিটা আরেক বার পড়ল। তারপর হাঁটুতে মুখ গুঁজে হু হু করে কেঁদে উঠল। বিভিন্ন আসবাবে ঠাসা আরামদায়ক ঘরটাকেও ফাঁকা ফাঁকা লাগতে শুরু করল। এই মুহূর্তে তার ঠিক করণীয় কী, বুঝে উঠতে পারছিল না। তবুও কী মনে হতেই দৌড়ে গ্যারেজে গিয়ে গাড়ি বের করল। পাগলের মতো গাড়ি চালিয়ে বিমানবন্দরে গেল। যদি কোনো কারণে বিমান আকাশে উড়তে দেরি করে? শুধু একটি বারের জন্যে উসমানের সাথে কথা বলতে চায়। যেকোনো মূল্যে। সে কি তার ওপর রাগ করেই চলে গেল? তা হলে ক্ষমা চাওয়া হলো না যে।

***

পরদিন জানা গেল আসল কারণটা। উসমান কেন এভাবে সবার অগোচরে ডেনমার্ক ছেড়ে গেল। থানা থেকে পুলিশ এল বাসায়। চার্চের ফাদারকে নিজ বাসভবনে 'গলাকাটা' অবস্থায় পাওয়া গেছে। ফাদার একাই বাসায় থাকতেন। উসমানের সাথে তার ভালো সম্পর্ক ছিল। মৃত্যুর সময় মিলিয়ে দেখা গেছে, হত্যাকাণ্ড ঘটার কিছুক্ষণ আগে উসমান ফাদারের বাসায় গিয়েছে। রাস্তার সিসি ক্যামেরার ফুটেজে এটাই দেখা গেছে। আর কেউ ফাদারের সাথে দেখা করতে যায়নি। পুলিশ মোটামুটি নিশ্চিত! এ কাজ উসমানের। ক্রিস্টিনা বলল :

-ও ফাদারের বাসায় গিয়েছে বলেই ও খুন করেছে, এমনটা তো প্রমাণ করা যাবে না।

-হত্যা না করলে, ও এমন হঠাৎ করে ডেনমার্ক ছেড়ে চলে গেল কেন! এতদিন হলো এ দেশে এসেছে! কখনো সে দেশের বাইরে তো দূরের কথা, কোপেনহেগেন ছেড়ে অন্য কোনো শহরে গিয়েছে বলেও রেকর্ড নেই!

***

পুলিশ আরও কয়েক বার এল। তারা বুঝতে পারল, এ ঘটনায় ক্রিস্টিনার কোনো হাত নেই। যথাসময়ে একটা কন্যাসন্তান পৃথিবীতে এল। ক্রিস্টিনা অভিমানে উসমানের আর কোনো খোঁজ নেয়ার চেষ্টা করল না। প্রথম প্রথম চাকরিও আর করবে না বলে ঠিক করলেও, পরে মায়ের চাপাচাপিতে সিদ্ধান্ত বদলাল। দোটানায় পড়ে গেল, সন্তানকে নিয়ে উসমানের ইচ্ছেগুলো পুরো করবে কি না। মা একজন নিষ্ঠাবান খ্রিষ্টান। তিনি কড়াভাবে নিষেধ করলেন এমন কিছু করতে। ক্রিস্টিনাও মায়ের কথা মেনে নেবে বলেই ঠিক করল। যে মানুষ তাকে এভাবে চলে গেছে। তার কথার মূল্য দেয়ার কী প্রয়োজন?

***

কিন্তু মেয়েটা যতই বড় হতে লাগল, ততই ক্রিস্টিনার মন কেমন যেন হয়ে আসতে লাগল। মেয়ের চেহারাটাতেও কেমন যেন উসমানের ছায়া খুঁজে পায় সে। চোখ, নাক সবই উসমানের। চুলও কালো। মায়ের মতো স্বর্ণকেশী নয়। নীলনয়না তো নয়ই। এমন কেন হলো? যে তার সমস্ত স্মৃতিকে পেছনে ফেলে চলে গেল, তারপরও কেন চিহ্ন রেখে গেল?

***

কুদসের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আজ কত স্মৃতি ভিড় জমাচ্ছে! বাহজাও কেন যেন চুপচাপ হাঁটছে। তার মনেও কি অদেখা বাবা এসে হাজির হয়েছে? মেয়েটার প্রতি সত্যি খুব মায়া হয়, সে জন্মের পর থেকে বাবার ছবি দেখেই বড় হয়েছে! তার বাবা বেঁচে আছে না মরে গেছে, সে খবরটুকু নিশ্চিতভাবে জানে না। জানার কোনো উপায়ও ছিল না। মানুষটা এমন নিষ্ঠুর! সামান্যতম সূত্রও পেছনে রেখে আসেনি। রীতিমতো হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। সরাসরি খোঁজ নেয়া যাচ্ছিল না। কারণ, ডেনিশ সিক্রেট সার্ভিসের 'মোস্ট ওয়ান্টেড' তালিকায় উসমানের নামও ছিল যে! ক্রিস্টিনার প্রতিও গোয়েন্দাদের একটা চোখ সব সময় ছিল। ক্রিস্টিনার সন্দেহ হতো মাঝে মাঝে। বাস্তবে যদিও এর কোনো প্রমাণ পায়নি। এ জন্য শাশুড়ির সাথে যোগাযোগ করার নম্বর থাকলেও, ব্যবহার করতে পারেনি। এমনকি স্বামীর শেষ উপদেশটাও পালন করতে পারেনি।

***

তবে সে ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করেছে। নবীজিকে নিয়েও অনেক পড়েছে। মেয়েকেও বাবার ধর্ম সম্পর্কে সাধ্যমতো জানিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, আরও অনেককেই সে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করেছে। তার এমন পরিবর্তন সে নিজেই অবাক! পুরো ডেনমার্কেই এক অবস্থা বিরাজ করছে। নবীজির ব্যঙ্গাত্মক ছবি আঁকার পর, মুসলমানদের প্রচণ্ড প্রতিবাদে ফেটে পড়তে দেখে, ডেনিশদের মনে কিছু কৌতূহল জন্ম নিয়েছে।

(ক) একজন মানুষের ছবি আঁকলে ক্ষতি কী? সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে এভাবে বিক্ষোভ করতে হয়? আচ্ছা, তাদের সাথে কথা বলেই দেখা যাক। কেন তারা এমন অযৌক্তিক আচরণ করছে।

(খ) একজন মানুষকে তার অনুসারীরা এভাবে ভালোবাসতে পারে? নিজের জানের মায়া তুচ্ছ করে? মানুষটা সম্পর্কে তো একটু জানতে হয়!

(গ) কই তারা তো পাল্টা প্রতিবাদ হিশেবে আমাদের জেসাস ক্রাইস্টের কোনো ব্যঙ্গাত্মক ছবি আঁকল না? ব্যাপার কী?

***

এ ধরনের কিছু কৌতূহল অনেক মানুষের হেদায়াতের কারণ হয়ে গেল। আরও অসংখ্য মানুষের মন হেদায়াতের জন্যে তৈরি হয়ে গেল। ক্রিস্টিনা এখনো দ্বিতীয় দলেই আছে। ইসলামের চেয়েও তার মনে এখন তার প্রিয় মানুষটাকে খুঁজে পাওয়ার আকুতি বেশি। এই আকুতি গত আট-নয় বছর জুড়েই ছিল। এই আকুতিই তাকে চারপাশের অনেক লোভের হাতছানি থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। অনেক লোভনীয় প্রস্তাব দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করতে বল জুগিয়েছে। মেয়েকে ঘিরেই গড়ে উঠেছিল তার নিজস্ব জগৎ।

***

দরজায় টোকা দিতেই খুলে গেল। বোনের সাথে অপরিচিত আরও দুজন বিদেশি মানুষ দেখে মারয়াম হকচকিয়ে গেলেন। তার কাছে আসার মতো কেউ নেই। শুধু প্রতি মাসের প্রথম দশ তারিখের কোনো একদিন, কে বা কারা এসে, গোপনে দরজার নিচ দিয়ে, মাসিক খরচাটা রেখে যায়। তা হলে এরা কারা!

-আপু, দেখো কাকে নিয়ে এসেছি! তুমি কল্পনাও করতে পারবে না, এরা কারা?

-সত্যি চিনতে পারছি না। আমার কাছে আসার মতো একজনই পৃথিবীতে আছে। কিন্তু তার তো ইহজীবনে আর এখানে আসা সম্ভব নয়। তা হলে কি...

-জি, ডেনমার্ক থেকে এসেছে!

-তুমি, তুমি 'ক্রিস্টিনা'?

-জি।

-তা হলে ওই খুকিটা?

-ও বাহজা! আপনার নাতনি!

-আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার! এত সৌভাগ্য আমার জীবনে আসবে! কই আমার কলিজার টুকরাটা কই! এদিকে এসো।

বাহজা পেছনে ছিল। সামনে এগিয়ে এসে দাদুকে জড়িয়ে ধরল। বুড়ো মানুষটার কান্না দেখে, বাকিদের চোখও ভিজে উঠল।

***

কথা যেন ফুরোতেই চায় না। অথচ কেউ কারও ভাষাই তেমন বোঝে না। ভাঙা ভাঙা বুঝ দিয়েই ভাবের আদান-প্রদান চলতে থাকল। ক্রিস্টিনাকে বলতে হলো, স্বামীর কথা। বাহজাকে বলতে হলো, দাদুকে নিয়ে সে কী ভেবেছে সে কথা! এক আনন্দঘন পরিবেশ। সবারই আলাদা আলাদা গল্প। সবকিছু ছাপিয়ে একজন মায়ের আকুলতাটাই প্রাধান্য পেল।

–ক্রিস্টিনা, তুমি আমার ছেলের কথা বলো! তাকে কেমন পেয়েছ? কেমন দেখেছ? কেমন বুঝেছ?

পুত্রবধূকে প্রশ্নে প্রশ্নে অস্থির করে তুললেন। এদিকে কিশোরী হয়ে পড়া নাতনিকে আদর করাও থেমে নেই। বাহজা অবাক হয়ে দেখছে দাদুকে। এমন আদরের সাথে সে পরিচিত নয়। এতটা আন্তরিক আর অকপট ভালোবাসাও সে আগে দেখেনি। তার মনে হচ্ছে, বুড়ো মানুষটা পারলে তাকে তার কলিজার ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলবেন। সেই যে হাতটা ধরেছেন, আর ছাড়াছাড়ির নাম নেই। যেন বাহজা কোথাও পালিয়ে যাবে।

***

মারয়াম নাতনির মাঝে পুত্রের প্রতিচ্ছবি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। তিনি স্বপ্নেও কখনো ভাবেননি, নাতনির সাথে দেখা হবে। বউমার সাথে সরাসরি

কথা হবে। তার যে একটা নাতনি আছে, সেটাই তো তার জানা ছিল না। শুধু ছেলে একবার ফোনে বলেছিল, তার নাতি হবে। তারপর থেকে ছেলের সাথেই যোগাযোগ নেই। কীভাবে যেন প্রতিমাসে কিছু টাকা পাঠায়। কোত্থেকে পাঠায়, কীভাবে পাঠায়, সেটা তার অজানা।

***

ক্রিস্টিনা তার জীবনবৃত্তান্ত বলল। এখন যে একটা অস্ত্র কারখানায় বৈজ্ঞানিক হিশেবে কর্মরত আছে সেটাও বলল। প্রস্তাব দিল :

-আপনিও আমাদের সাথে চলুন না!

-না মা, আমি কুদসের কোল ছেড়ে আর কোথাও যাব না। আমরা কুদসকে ইহুদীদের হিংস্র থাবা থেকে উদ্ধার করতে পারছি না। কিন্তু কুদসকে এতিম করেও চলে যেতে পারব না। কুদসের জন্যে আমার স্বামী শহীদ হয়েছে। সন্তানেরা শহীদ হয়েছে। আরেক সন্তান থেকেও নেই। আমরা হাজার বছর ধরে এখানে বাস করে আসছি। আল্লাহ এই অঞ্চলকে 'বরকতময়' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই ভূমি চিরকালের জন্যেই বরকতময়। আমি এই বরকত ছেড়ে যেতে চাই না। আমার আব্বুও বায়তুল মুকাদ্দাসের জন্যে জীবন দিয়েছেন। ইজ্জুদ্দীন কাসসামের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জিহাদ করেছেন। আমার ইচ্ছে ছিল, আমার অবশিষ্ট ছেলেটাও কুদসের জন্যে শহীদ হবে। কিন্তু কীভাবে যে কী হয়ে গেল!

-মুরাবিতের সাথে আপনার কথা হয়? তার ঠিকানাটা কি পেতে পারি?

-না মা, তার সাথে আমার কথা হয় না। তোমার কাছ থেকে চলে আসার পর, মাত্র একবার কথা হয়েছিল। সেই সাত-আট বছর আগে। তারপর থেকে আর কোনো যোগাযোগ নেই।

-সেবার কোথা থেকে ফোন করেছিল, বলেছিল কিছু?

-না, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে বলেছে এটা নাকি আমার না জানাই ভালো। সেটাই শেষবার। তারপর আর যোগাযোগ নেই।

-তবে কি তিনি আর...!

-না না, আমার ছেলে মারা যায়নি। সে আছে। দূরে কোথাও আছে।

-কীভাবে বুঝলেন?

-নইলে আমার জন্যে প্রতিমাসে কে টাকা পাঠায়?

-একটা প্রশ্ন আমাকে প্রায়ই তাড়িয়ে বেড়ায়। আপনি কি জানতেন মুরাবিত বৈরুতে থাকার সময় খ্রিষ্টান হয়ে গিয়েছিল?

-এতটা পরিষ্কার করে জানতাম না। তবে অন্যদের কাছে শুনেছিলাম, সে আর নিষ্ঠাবান মুসলমান নেই। কিন্তু আমার ছেলে, যাকে আমি কুদসের জন্যে কুরবান করেছি, সে খ্রিষ্টান হয়ে যাবে, এটা আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয়নি।

-এ জন্যেই কি বিয়ের আয়োজনটা ইসলামীমতে করার উপদেশ দিয়েছিলেন?

-ওটা দিয়েছিলাম কয়েকটা কারণে। বিয়ের শুরুটা ইসলামী মতে হলে, এর বরকতে তোমাদের দুজনের জীবনটা বদলে যেতে পারে। তোমাদের সন্তানের ভবিষ্যৎ সুন্দর হবে। তুমি ইসলাম সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠবে।

-আমি এভাবে ভাবিনি।

-শোনো মা, তোমার যদি ভালো লাগে, মনে সায় দেয়, ইসলাম গ্রহণ করে ফেলো! এই অল্প সময়ে তোমাকে আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি, তুমি ভালো একটা মেয়ে।

-জি, আমি মনে মনে ঠিক করেছি, জীবনে একটি বারের জন্যে হলেও, মুরাবিতের সাথে দেখা হোক, তা হলেই আমি মুসলমান হয়ে যাব।

-ভালো চিন্তা! তবে চিন্তাটা তুমি এভাবেও করতে পার, আল্লাহ আমি ইসলাম গ্রহণ করে ফেললাম! আপনি আমার স্বামীকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিন।

-খুব সুন্দর করে বলেছেন। আপনার কথাই তা হলে মনেপ্রাণে মেনে নিলাম।

***

ক্রিস্টিনার মনটা আশা-নিরাশার দোলাচলে দুলতে লাগল। মুরাবিতের কোনো ঠিকানা পাওয়া গেল না। মানুষটাকে একনজর দেখার জন্যে এতদূর ছুটে আসা। কিন্তু এই বিশাল দুনিয়ায় কোথায় খুঁজতে যাবে? বাহজাও ভীষণ মন খারাপ করল। তার ধারণা ছিল, এখানে এসে আব্বুর সাথে দেখা হবে। হলো না। অবশ্য দাদুর সাথে দেখা হওয়াতে তার কী যে ভালো লাগছে! বলার মতো নয়। শুধু মন চাইছে, এই বুড়ো মানুষটার সাথে থেকে যায়। কিন্তু আম্মু যে একা হয়ে পড়বেন!

***

কীভাবে যে এক দিন এক রাত কেটে গেল টেরও পাওয়া গেল না। বুড়ো মানুষটা কষ্ট করে, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব জায়গা দেখিয়েছেন। পুরো মসজিদে আকসা কমপ্লেক্সটার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তার ছেলেবেলার স্মৃতিময়-গীতিময় স্থানগুলোর স্মৃতিচারণ করেছেন। নাতনিকে মন উজাড় করে স্নেহ দিয়েছেন। পুত্রবধূকে বুকের সমস্ত ভালোবাসা দিয়েছেন। এবার বিদায়ের পালা। পাইথন আগামীকাল ভোরেই নোঙর তুলবে। বন্দর ছেড়ে ডেনমার্কের উদ্দেশে রওনা দেবে। ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ আর থাকার অনুমতি দিচ্ছে না।

***

নাতনিকে ছাড়তে মারয়ামের বুকটা যেন ফেটে যাচ্ছিল। মেয়েটা ডুকরে কেঁদে উঠল। ক্রিস্টিনার বার বার ইচ্ছে হচ্ছিল, যা হবার হবে, এই বুড়ো মানুষটাকে একা রেখে সে কোথাও যাবে না। কিন্তু ইচ্ছা করলেই তো হয় না। জীবনে আর কখনো দেখা হবে না। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টায় এত মায়া কীভাবে জন্মায়? একটা বুড়ো মানুষের প্রতিও এভাবে ভালোবাসা জন্মায়?

***

একটা অতৃপ্তি নিয়ে ফেরা হলো। আবার কাজ আর কাজ। ল্যাবের কাজ, মেয়েকে সময় দেয়া। মায়ের কাছে যাওয়া। ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করা। এভাবেই সময় কেটে যাচ্ছিল। পাশাপাশি বিভিন্ন সেবামূলক কাজে নিজেকে বিলিয়ে দেয়াও চলছিল। সেবা-সংস্থা থেকে বলা হলো, এবার ত্রাণ নিয়ে তুরস্কে যাওয়া হবে। ওখানে সিরিয়ান উদ্বাস্তদের অত্যন্ত করুণ অবস্থা। ইচ্ছে হলে ক্রিস্টিনাও দলে যোগ দিতে পারবে। মনটা এগুচ্ছিল না। কী হবে? টাকা দিয়ে সাহায্য করলেই হবে। বাহজার জন্যে শেষতক যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হলো। কথাটা শুনেই সে যাওয়ার বায়না ধরল। তার মধ্যে এই একটা বিষয় বেশ লক্ষণীয়, দুঃখী মানুষের প্রতি তার প্রগাঢ় মমতা। এটা সে কোত্থেকে পেল?

***

যা ভাবা হয়েছিল, বাস্তবে অবস্থা আরও শোচনীয়। প্রচণ্ড শীত। তুরস্ক তাদের সাধ্য অনুযায়ী যা করার করেছে। কিন্তু তাও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ক্রিস্টিনারা যে যৎসামান্য ত্রাণ নিয়ে এসেছে, সেটা দিয়ে কিছুই হবে না। তবুও মানুষের দুঃখ-কষ্টকে কাছ থেকে দেখার উপকারিতা

আছে। নিজের ভেতরে একধরনের প্রতিজ্ঞা জন্ম নেয়। নিজেকে আরও বেশি বিলিয়ে দেয়ার ইচ্ছেটা প্রবল হয়। ক্রিস্টিনা ও বাহজা উভয়েরই প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ নেয়া ছিল। তাদের সংস্থার সবারই এটা করা আছে। মা ও মেয়ে দুজনেই মেডিক্যাল কোরে নাম লেখাল। নেমে পড়ল আহতদের সেবা-শুশ্রূষায়। মনপ্রাণ সঁপে দিল। দুজন একসাথেই ডিউটি করে। বাহজা কম্পিউটার প্রোগ্রামিংসহ এ বিষয়ক কাজগুলো ভালো পারে। তাই সে কিছু সময় কম্পিউটার বিভাগেও থাকে। সাহায্যের জন্যে অনলাইনে প্রচারণা চালায়। প্রচুর সাড়াও মেলে।

***

উদ্বাস্তুদের নতুন একটা দল এসেছে। আহত আছে বেশ কিছু। জরুরি তলব পেয়ে ক্রিস্টিনা ছুটে গেল। বাহজা তখন আইটি সেকশনে। মেয়ে ছাড়াই চলে গেল ক্রিস্টিনা। সার সার অসুস্থ মানুষ শুয়ে-বসে আছে। দুজনকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেয়ার পর, তৃতীয়জনের কাছে আসতেই ক্রিস্টিনা চমকে উঠল। দূরে উল্টো দিকে ও মাথার একটা রোগী তার দিকে অপলকনেত্রে তাকিয়ে আছে! বুকটা ধক করে উঠল। মানুষটাকে চেনা চেনা লাগছে যে? দাড়িতে পুরো মুখখানা ঢেকে গেলেও, সেই চোখ, সেই ঠোঁট তো আর ঢাকেনি! তার দিকেই কি তাকিয়ে আছে? তা হলে তাকে চিনতে পারছে না কেন! তার চেহারার তো কোনো পরিবর্তন হয়নি। চোখাচোখি হতেই মানুষটা অন্যদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল।

***

ক্রিস্টিনা ভীষণ দোটানায় পড়ে গেল। কাছে যাবে? যদি সে না হয়ে অন্য কেউ হয়? তার পা'টা যেন মাটিতে জমে গেছে। তার এমন লাগছে কেন! মাথাটা কেমন করছে! সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না। এই মানসিক অস্থিরতা নিয়ে অন্য রোগীর দিকে মনোযোগ দেয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। উল্টো রোগীর ক্ষতি হওয়ার সমূহসম্ভাবনা। আর যাই, সে তো আর পেশাদার ডাক্তার নয়। বড়জোর শিক্ষানবিশ নার্স বলা যেতে পারে তাকে। হাত-পা কাঁপছে। আচ্ছা একবার কাছ দিয়ে ঘুরেই আসি না কেন! দুরুদুরু বুকে কাছে গিয়ে ফিসফিস বলল,

–মুরাবিত!

ঝট করে এদিকে ফিরল মানুষটা। চোখটা ঝিকিয়ে উঠেই আবার নিভে গেল। অপলক তাকিয়ে রইল ক্রিস্টিনার দিকে। কী আছে এই চাহনিতে? আনন্দ? বেদনা? ভালোবাসা? প্রতীক্ষার অবসান? উপেক্ষা? অবজ্ঞা? বোঝা যাচ্ছে না। দুর্বোধ্য দুর্জ্ঞেয় এই দৃষ্টি! কী তীক্ষ্ণ! কী ক্ষুরধার! কী অন্তর্ভেদী! যেন শান দেয়া ছুরি! ক্রিস্টিনা আবার ফিসফিস করল,

–আমাকে চিনতে পারছ না?

শুয়ে থাকা মানুষটা কী যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল। চোখটা বন্ধ করে ফেলল। বেশ খানিকটা সময় বন্ধই থাকল। তারপর চোখ খুলতেই ঠোঁট নড়ে উঠল :

-তোমাকে কি ভোলা যায়?

-আমি স্বপ্ন দেখছি না তো!

-এ প্রশ্নটা নিয়েই তো এতক্ষণ ভাবছিলাম! আচ্ছা যাক। তাড়াতাড়ি কয়েকটা কথা শুনে নাও! আমার ছবি তুর্কি কর্তৃপক্ষের কাছে আছে। ডেনিশ পুলিশই দিয়েছে। তুমি আমার পূর্বপরিচিত, এটা একদম গোপন করে রাখবে। আমার জখম মারাত্মক কিছু নয়। আমি তোমাকে পরে সময়মতো খুঁজে নেব। এখন চট করে সরে পড়ো।

***

পা-টা মোটেও নড়তে চাইছিল না। তবুও একরকম বাধ্য হয়েই নিজের কাজে গেল। মনটা পড়ে রইল ওখানে! এটা কী করে সম্ভব? তবে কি আল্লাহ তার দুআ শুনেছেন? ইসলামগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়াতে আল্লাহ খুশি হয়েছেন? মুরাবিতের মায়ের দুআ কি তা হলে আল্লাহ কবুল করেছেন? মুরাবিত এখানে কীভাবে এল? কোথায় ফিলিস্তিন, কোথায় ডেনমার্ক আর কোথায় তুর্কি সীমান্তের শরণার্থী শিবির! ভীষণ আকুলি-বিকুলি করছে! উত্তরগুলো না জানা পর্যন্ত মনটা কিছুতেই শান্ত হবে না।

***

মুরাবিতের ঘোর এখনো কাটেনি! সে কি জিন দেখেছে? অবিশ্বাস্য এই ঘটনার ব্যাখ্যা কী? আল্লাহর কাছে দুআ করেছে। ক্রিস্টিনার হেদায়াতের জন্যে। কিন্তু কখনো দুজনে দেখা হয়ে যাবে, এটা এতই অসম্ভব একটা কল্পনামতো হতো, তাই আল্লাহর কাছে দুআ করার সময় মনে হতো, এই

দুআ করার চেয়ে জান্নাত পাওয়ার দুআ আরও বেশি সহজ! আল্লাহ, তুমি এত এত মেহেরবান! তোমাকে চিনলাম না! মুরাবিত ভেবেই যাচ্ছে। কোন ফাঁকে ডাক্তার তার ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছে, কোন ফাঁকে সে ক্লিনিক-তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, কিছুই বলতে পারবে না। বাইরে এসে বেশি দূরে গেল না। আশেপাশেই ঘুরঘুর করতে লাগল।

শুধু ঘোরাঘুরি করলেই তো হবে না। তার নির্দিষ্ট কাজ আছে। আহত হয়ে এখানে আসা স্রেফ একটা কৌশলমাত্র। তাকে বেশ কিছু দিক সামলাতে হবে।

- এখানে মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে কিছু দুষ্ট খ্রিষ্টান মিশনারি তাদের ভ্রান্তধর্ম প্রচারে নেমে পড়েছে। এই লোকগুলোকে চিহ্নিত করে গোপনে তাদের একটা বিহিত করা।
- এখানে যারা আসে, তাদের মধ্যে অনেক উপযুক্ত মানুষ থাকে। তাদের বুঝিয়ে শুনিয়ে 'কাজে' নিয়ে যাওয়া। ফিরে যেতে উদ্বুদ্ধ করা।
- যারা 'কাজের' উপযুক্ত নয়, তাদের বিস্তারিত হালত জানিয়ে, দাওয়াতি কাজ চালানোর দায়িত্ব দিয়ে যাওয়া।

***

মুরাবিত তার কাজে নেমে পড়েছে। এর মধ্যেই দুজন বিদেশির গতিবিধি সন্দেহজনক ঠেকেছে। দেখতে সেবাকারী হলেও, বাস্তবে হয় গোয়েন্দা নইলে ধর্মপ্রচারক! এই করতে করতে রাত হয়ে গেল। ক্রিস্টিনা বের হবে! কাছে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। মুরাবিত এখানে আগেও একবার এসেছে। কাজ করে গেছে। তাই চারিদিক তার নখদর্পণে। ক্রিস্টিনাকে নিয়ে নিরাপদ একটা জায়গায় গিয়ে বসল।

-ক্রিস্টিন, তুমি কি একাই এসেছ?

-জি না। বাহজাও এসেছে।

-বাহজা?

-জি, আমাদের মেয়ে।

-সুবহানাল্লাহ! আলহামদু লিল্লাহ! তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না, আমার কী ভালো যে লাগছে! তোমাকে দেখতে পাব, এমন চিন্তা কল্পনাতেও ছিল না। আমার মা-টা কোথায়?

-একটু বসো। নিয়ে আসছি!

★★★

মুরাবিত জায়গা বদল করে বসল। সতর্ক থাকা জরুরি। বলা যায় না। হয়তো তুর্কি গোয়েন্দারা টের পেয়ে গেছে। ক্রিস্টিনার পরিচয়ও জেনে গেছে। তাকে টোপ হিশেবেই পাঠাতে পারে! বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। দূর থেকে মেয়েকে দেখে চমকে উঠল! কী আশ্চর্য! মেয়েটা হুবহু তার দাদুর আদল পেয়েছে যে? ক্রিস্টিনার কিছুই পায়নি বলতে গেলে। নিষ্পাপ সৌন্দর্যটুকু ছাড়া। ইচ্ছে হচ্ছিল ছুটে যায়! কিন্তু এটা করা চলবে না। সতর্ক থাকতে হবে। নিশ্চিত হয়ে তারপর আড়াল থেকে বের হলো।

★★★

পিতা-পুত্রীর মিলনটা দেখার মতো হলো। ভাগ্যিস, আশেপাশে কেউ ছিল না। বাবাও কাঁদছে, মেয়ের চোখের জলও বাঁধ মানছে না। বাবার বুকে মুখ লুকিয়েই বলল :

-আব্বু, আমরা দাদুর কাছে গিয়েছিলাম।

মুরাবিত যেন শক খেল! সীমাহীন বিস্ময় আর অবিশ্বাসভরা গলায় বলল,

-সত্যি ক্রিস্টিন! আম্মুর কাছেও তোমরা গিয়েছিলে?

-জি!

-ক্রিস্টিন, তোমার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতাবোধ যে কতটা গভীর হয়ে গেল, বোঝাতে পারব না! তুমি যে এতটা ভালো একটা মেয়ে, সেটাও আমি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছি! তুমি তুমি আমার সমস্ত কল্পনা, আমার সমস্ত স্বপ্নকেও ছাড়িয়ে গেছ!

-আমি কিছুই করিনি! তোমার প্রতি আমার কতখানি ভালোবাসা, সেটা তোমাকে যদি দেখাতে পারতাম! শেষ চিঠিতে তুমি আমাকে যা যা করতে বলে এসেছিলে, তার সবটাই আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি।

★★★

দ্বিতীয় দিন তিনজনে আবার মিলিত হলো। দিনের আলোতে একত্র হওয়ার মাঝে ঝুঁকি রয়েছে। নতুন আরেকটা স্থানে। কত কত কথা বাকি এখনো! অথচ সময় নেই। তাড়াতাড়ি কিছু একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে! দু-পক্ষই আজ বড় চুপচাপ। বাবার কোল ঘেঁষে বাহজা বসে আছে। আরেক পাশে ক্রিস্টিনাও স্বামীর হাত ধরে চুপচাপ। দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে মুরাবিত বলল :

-আমাকে পরশু এখান থেকে চলে যেতে হবে। তোমরা কয়দিন থাকবে?

-আমরা আরও কিছুদিন থাকব। তোমার সাথে কি আর দেখা হবে না? মানে তুমি আর এদিকে আসবে না?

-আমি তো স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারি না। ওপরের নির্দেশেই এখানে-সেখানে যাই! যখন যেখানে যেতে বলা হয়, সেখানে যাই।

-তুমি কী করো, সেটা কি আমাকে খুলে বলতে কোনো বাধা আছে? তুমি ডেনমার্ক থেকে কোথায় গেলে সেটা নিয়েও গতকাল জানার খুব আগ্রহ হচ্ছিল, তুমি নিজ থেকে বলবে মনে করে আর প্রশ্ন করা হয়নি।

-আমি ডেনমার্ক থেকে সোজা লেবাননে আসি। বৈরুতে নেমেই দ্রুত সীমান্ত পাড়ি দিয়ে সিরিয়াতে চলে আসি। না হলে ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। দামেস্কে ছিলাম কিছুদিন। তারপর চলে গেলাম ইরাকে।

-ওখানে?

-ওখানকার মাজলুম ভাই-বোনদের কান্না আর সহ্য হচ্ছিল না। দামেস্ক থেকে আমরা বিশজনের একটা কাফেলা যোগ দিয়েছিলাম। সেই কাফেলার কিছু লোক এখানেও আছে। একসাথেই এসেছি। একই কাজ নিয়ে।

-মুরাবিত, আমি বুঝতে পেরেছি তোমাকে আগেও তোমার কাজে আমি বাধা দিয়ে রাখতে পারিনি। এখনো পারব না। আগে আমি ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে জানতাম না, তবে এখন অনেক কিছু বুঝি! তাই তোমার আবেগ, তোমার চিন্তাধারা ধরতেও আমার সুবিধে হয়। তোমার কাছে শুধু আমার একটাই প্রশ্ন, আমরা কী করব?

-ক্রিস্টিন, সেটা তোমাকেই ঠিক করতে হবে।

-তোমাকে ছাড়া যে আমার আর কিছুই চাওয়ার নেই! তুমি কি আমাদের তোমার সাথে নেবে?

-সেটা হবে আমার জন্যে পরম পাওয়া। চরম সৌভাগ্যের বিষয়। আশাতীত আনন্দের!

-বিশ্বাস করো, আমি একজন অস্ত্র-বিশেষজ্ঞ। আমাদের মেয়ের যোগ্যতাও যা তা নয়। তার বয়স কম হলেও, সে একজন ভালো কম্পিউটার প্রোগ্রামার। অত্যন্ত দক্ষ হ্যাকার।

-আচ্ছা, তাই নাকি? দারুণ খবর! তা হলে তো আমার মামণির দাম তোলায় তোলায় হবে! এমন মানুষ আমাদের এখন অনেক অনেক বেশি দরকার! আর ক্রিস্টিন, তোমার মতো যোগ্যতার অধিকারী কেউ আমাদের ওখানে গেলে, সেটা হবে আমাদের জন্যে অনেক বড় পাওয়া। আমার মনে হচ্ছে, আমার ফিলিস্তিন থেকে পালানো, লেবাননে যাওয়া, সেখান থেকে ডেনমার্ক যাওয়া, চার্চে তোমার ব্যাগ রেখে যাওয়া, সব একসূত্রে গাঁথা। সবই আল্লাহর অপূর্ব এক কর্মকৌশলের নিদর্শন! আমার শুধু একটা ব্যাপারে খটকা আছে।

-কিসের খটকা?

-তোমরা একভাবে এতদিন থেকে এসেছ। এখন কি পরিপূর্ণ শরীয়ত ব্যবস্থার অধীনে গিয়ে থাকতে পারবে? পরিপূর্ণ বোরকা পরতে পারবে? পরে আবার মন বদলে যাবে না তো?

-মুরাবিত, সবকিছু ত্যাগ করে তোমাকে পাওয়ার জন্যে এতদূর এসেছি দেখেও কি তোমার সন্দেহ হচ্ছে? তুমি পাশে থাকলে, আমি দুনিয়ার যেকোনো স্থানে যেতে রাজি! তোমার জন্যে আমি যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি! তোমাকে আমার ভুলের কারণে একবার হারিয়েছি, এবার আর হারাতে চাই না!

জীবন জাগার গল্প: ৬২১

তিউনিশিয়ান জিম্মি

-১-

শারম আশ শায়খ। মিশরের বিখ্যাত পর্যটনকেন্দ্র। সারাবিশ্ব থেকে পর্যটকরা এখানে ভিড় জমায়। সুদূর রাশিয়া থেকে শুরু করে পাশের দেশ ইসরায়েলের লোক পর্যন্ত এখানকার সুনীল সাগরের দুর্নিবার টানে ছুটে আসে। মিশর ও ইসরায়েলি সরকার সর্বাত্মক চেষ্টা করে, এখানে আসা পর্যটকরা যেন নিরাপদ থাকে। এত কঠিন নিরাপত্তাবলয় ভেদ করেও মাঝেমধ্যে, আল্লাহর কিছু অকুতোভয় বান্দা তাদের উদ্দেশ্য সাধন করতে সমর্থ হয়। সিনাইয়ে একটা রাশান বিমান ভূপাতিত করা হয়েছে। এটা ছিল ঘটনার এক দিক। পাশাপাশি আরেকটা দিক মিডিয়াতে আসেনি। সেটা হলো, বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার সংবাদ চাউর হয়ে যাওয়ার পর শারম আশ শায়খে অবস্থানরত পর্যটকদের মধ্যে ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায়। তখনকার বিশৃঙ্খল অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে কিছু জিম্মি সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে একটা অভিযান পরিচালনা করা হয়।

দ্বিতীয় অভিযানটা শতভাগ না হলেও, আংশিক সফল হয়েছিল। তবে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। জিম্মিকারীরা যখন চারজন ইসরায়েলি তরুণকে বন্দী করে রওনা দিয়ে গাড়ি ছাড়তে যাবে, কোত্থেকে যেন আরেকজন তরুণী এসে নিজ থেকেই অনুরোধ করল তাকেও যেন বন্দী করা হয়। সেও স্বেচ্ছায় জিম্মিত্ব বরণ করবে! অবাক হলেও জিম্মিকারীরা দ্রুত সিদ্ধান্তে এল। মেয়েটার আচরণ সন্দেহজনক তবুও তাকে গাড়িতে উঠিয়ে নেয়া হলো। হাত-চোখ বেঁধে।

নির্দিষ্ট একটা গন্তব্যে যাওয়ার পর, পাঁচজন বন্দীকে আলাদা আলাদা ঘরে রাখা হলো। ভালো করে সার্চ করে দেখা হলো, সাথে কোনো গোপন ডিভাইস আছে কি না। তরুণীটিকেও একজন মহিলা দীর্ঘ সময় নিয়ে সার্চ করল। পোশাকের পাশাপাশি অন্য কোথাও গোপন চিপস পুশ করা আছে কি না, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে দেখা হলো। সম্ভাব্য সবরকমের সতর্কতা অবলম্বন করা হলো। সাধারণত জিম্মিদের এক জায়গায় বেশিক্ষণ রাখা হয় না। সংখ্যায় বেশি হলে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখা হয়। চেষ্টা করা হয় বন্দীদের দ্রুত দূরবর্তী কোনো স্থানে নিয়ে যেতে। বিপক্ষের উদ্ধার-অভিযান চালানোর সম্ভাব্য এলাকার বাইরে।

***

সবকিছু গুছিয়ে নেয়ার পর শুরু হলো জেরাপর্ব। মেয়েদের জেরা করা ও বন্দী করে রাখার স্থান আলাদা। নিরাপত্তাজনিত কারণে মেয়েটা সম্পর্কে ভালোভাবে খোঁজ নেয়ার জন্যে ওপর থেকে বিশেষ নির্দেশ এল।

-আপনার সম্পর্কে বলুন!

-আমি দীমা। বায়ো-টেকনোলজি নিয়ে পড়ছি। তেলআবিবে থাকি। আমার মা থাকে হাইফাতে।

-বাবা নেই?

-আছেন।

-কোথায়?

-তিউনিশিয়াতে।

-ব্যাপারটা কেমন হয়ে গেল না!

-ঠিক আছে, আমি আমার মতো করে বলি?

-জি, বলুন!

-আমার জন্ম তিউনিশিয়ার জিরবায়। সেখানে প্রাচীনকাল থেকেই ইহুদীরা বাস করে আসছে। এখনো বাস করে। আমার মা একজন আরব ইহুদী। আব্বু একজন মুসলিম। ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর, বিশ্বের অন্যান্য স্থানের মতো জিরবা থেকেও ইহুদীরা দলে দলে ইসরায়েলে পাড়ি জমাতে শুরু করে। অবশ্য বলা ভালো, তাদের পাড়ি জমাতে বাধ্য করা হয়।

-কেন?

-৪৭ সালে বেলফোর ঘোষণার আগে থেকেই ফ্রান্স থেকে একদল লোক নিয়মিত আমাদের জিরবাতে আসত। বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে তারা বক্তব্য রাখত। কঠোর গোপনীয়তার মধ্য দিয়ে। উপস্থিত ইহুদীদের তারা বোঝাত, ইসরায়েল-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা। সবাই মিলে সে রাষ্ট্রগঠনের গুরুত্বের কথা। ইহুদীদের অস্তিত্বের সংকটের কথা। এমন একটা রাষ্ট্র যদি গঠন করা হয়, সবাইকে সেখানে চলে যেতে হবে। সেটা হবে স্বপ্নের রাষ্ট্র। তাওরাত-তালমুদের রাষ্ট্র। দাউদ আর সুলাইমানের আদর্শে গড়া রাষ্ট্র। সেখানে কোনো ইহুদী না খেয়ে থাকবে না। অত্যাচারিত হবে না। অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানহীন থাকবে না। অবসান ঘটবে হাজার-হাজার বছরের ছন্নছাড়া উদ্বাস্তু জীবনের। প্রথম প্রথম শুধু উৎসাহব্যঞ্জক কথা বলা হতো। রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার পরও গোপনে গোপনে তুমুল প্রচারণা চালানো হলো। আস্তে আস্তে উৎসাহের ভঙ্গি বদলে ভয় আর হুমকিপ্রদান শুরু হলো। বাস্তুভিটা ছেড়ে সবাইকে ইসরায়েলে যেতেই হবে। না গেলে যেকোনোভাবেই হোক, বাধ্য করা হবে।

***

আমার নানার বাড়ি আর দাদার বাড়ি ছিল পাশাপাশি। দু-বাড়ির সম্মতিতেই আব্বু-আম্মুর বিয়ে হয়। আমাদের জিরবাতে এমন আন্তঃধর্মীয় বিয়ে প্রায়ই হতো। ইহুদীরা নিজেদের অস্তিত্ব নিরাপদ রাখার জন্য এমন বিয়েতে সায় দিতে কসুর করত না। তবে সাধারণত পাত্র থাকত মুসলিম আর পাত্রী হতো ইহুদী। বিয়ের আগে ইহুদী রাব্বীরা পাত্রীদের পেছনে দীর্ঘ সময় ব্যয় করত। বার বার একটা কথাই তাদের বোঝানো হতো, তোমার বিয়ে একজন মুসলমানের সাথে হলেও তুমি একজন ইহুদীই থাকবে। যতই কালিমা-কুরআন পড়ো না কেন, কিছুতেই তুমি ইহুদী ধর্ম থেকে বের হতে পারবে না। একদিনের ইহুদী মানে চিরদিনের ইহুদী।

***

আব্বু ছিলেন মনেপ্রাণে মুসলমান। দাদু ছিলেন আরও বেশি মুসলিম। আম্মুও প্রথম প্রথম ইহুদী-ভাব ধরে থাকলেও, পরের দিকে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা করতেন। কিন্তু কিছুদিন পর তাকে গোপনে ডেকে নিয়ে বোঝানো হলো, তিনি সম্পূর্ণরূপে ইহুদীধর্ম ত্যাগ করলে আমার সমস্যা

হবে। বাধ্য হয়ে আম্মুকে তাদের কথা মানতে হলো। আস্তে আস্তে আম্মু আবার মনেপ্রাণে ইহুদী হয়ে গেলেন। অবশ্য বাইরে বাইরে নিজেকে একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসেবেই প্রকাশ করতেন। নানুর সাথে দেখা করতে যাওয়ার ছুতোয় তিনি বিশেষ লোকদের সাথে বৈঠক করতেন। আমাকেও নানা ভঙ্গিতে ইহুদীধর্মের কথা বলতেন। তাওরাত পড়তে শেখাতেন। আব্বুকে এসব ঘুণাক্ষরেও টের পেতে দিতেন না।

***

আম্মুর বহুমুখী তৎপরতায় কর্তৃপক্ষ বেজায় খুশি। তারা আম্মুকে তেলআবিবে নিয়ে যাওয়ার কথা বলল। প্রথম প্রথম তিনি নাকচ করে দিলেও, পরে তাদের চাপাচাপিতে বা হুমকিতে নমনীয় হলেন। সমস্যা দেখা দিল, আমি আর আব্বুকে নিয়ে। দুজনের কী হবে? তারা বলল, আমি যেহেতু ছোট, আমাকে সাথে নিয়ে যাওয়া যাবে। আর আব্বুর ব্যবস্থা তারা করবে। আম্মু তাদের কাছে অনুরোধ করলেন, আব্বুর যেন কোনোরকম ক্ষতি না হয়।

***

আমার বয়েস তখন কতো হবে? বড়জোর দশ! কিছুদিন পর আব্বুকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে গ্রেপ্তার করা হয়। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় হলো। তিউনিশিয়াতে প্রকাশ্যে নামধারী মুসলিম সরকার থাকলেও, প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ইহুদীদের প্রভাব রয়ে গেছে। গোপনে তেলআবিব থেকেই সবকিছুর কলকাঠি নাড়া হয়। আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে, ইসরায়েলের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্কের দিক থেকে, মিশরের পরই তিউনিশিয়ার অবস্থান। বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন সিনাগগ আমাদের জিরবাতেই অবস্থিত। আর রাজধানী তিউনিশে রয়েছে বিশ্বের অন্যতম বড় 'সিনাগগ'। ওখানকার ইহুদীদের বেশির ভাগ ইসরায়েলে চলে গেলেও, তাদের প্রভাব ঠিক আগের মতোই রয়ে গেছে। ফরাসিরা তিউনিশ ত্যাগের সময়ই ইহুদীদের নিজেদের মনমতো করে 'সেটআপ' দিয়ে গেছে। পুরো দেশ ওলট-পালট করা ছাড়া, এই সেটআপ ভাঙা অসম্ভব। এ জন্য দেখা গেছে, আরব-বসন্তের ঢেউ সবদিক ভাসিয়ে নিলেও, তিউনিশ ঠিক আগের মতোই সেক্যুলার রয়ে গেছে। পটের কোনোধরণের পরিবর্তন হয়নি।

***

কাগজপত্র আগেই প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল। আব্বু জেলে যাওয়ার কিছুদিন পরই আম্মু সবাইকে বলেছেন, তিনি এক আত্মীয়ের কাছে কিছুদিনের জন্যে থাকতে প্যারিস যাচ্ছেন। তারপর থেকে আমরা ইসরায়েলে। আম্মুর সাথে এখানে আসতে আমি মোটেও রাজি ছিলাম না। তিনি আমাকে বুঝিয়েছেন কিছুদিন প্যারিসে থেকে দ্রুতই ফিরে আসবেন। আমার এক চাচা বাধা দেয়ার অনেক চেষ্টা করেছেন। তিনি বোধহয় কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলেন। শুরু থেকেই তিনি ছোট ভাইয়ের ইহুদী মেয়ে বিয়ের ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু দাদাজান ইসলামধর্মের প্রতি আম্মুর গভীর অনুরাগ দেখে, না করতে পারেননি।

***

-আচ্ছা, সে না হয় বুঝলাম! আপনি শারম আশ শায়খে কেন?

-এটাই হলো আলোচনার মূল জায়গা। বুঝতে পারছি না, আমার কথা আপনাদের বিশ্বাস হবে কি না!

-বিশ্বাস করব কি করব না, সেটা আমাদের ব্যাপার! আপনি আপনার বক্তব্য বলে যান!

-শুরুতেই একটা অনুরোধ করে রাখি, আমি যে স্বেচ্ছায় বন্দী হয়েছি সেটা বাকি চারজন যেন না জানে। আমি শারমে এসেছি আম্মুকে লুকিয়ে। অনেকেই এখানে বেড়াতে আসে। কিছু আনন্দ কিনতে আসে। আমি তাদের মতো কোনো ঠুনকো উদ্দেশ্য নিয়ে আসিনি। আমি এসেছি মূলত সিনাইয়ে! শারামে নয়।

-সিনাইয়ে কোথায়?

-আপনাদের কাছে!

-ব্যাপারটা বিদঘুটে শোনাচ্ছে না?

-সে জন্যই তো আগেই বলে দিয়েছি। বিশ্বাস করা বা না করা আপনাদের ব্যাপার!

-আপনি একজন ইহুদী হয়ে, কেন আমাদের কাছে আসবেন?

-আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, আমি সুনির্দিষ্ট একজনের সাথে দেখা করতে এসেছি! জানতাম এতে আমার প্রাণ যাওয়ার আশঙ্কা শতভাগ! কিন্তু আমি মরিয়া।

-কার সাথে দেখা করতে এসেছেন?

-মাহমুদ মাহের! তিউনিশিয়ান! আজহার থেকে এসে আপনাদের সাথে যোগ দিয়েছেন!

-এখানে আসল নামে কেউ পরিচিত হয় না। সবারই একটা কুনিয়ত (উপনাম) থাকে! আচ্ছা, আমরা যাচাই করে দেখব! তো তার কাছে আপনার কী প্রয়োজন?

-তিনি আমার বড়ভাই?

-কেমন বড়ভাই?

-আমার চাচাতো ভাই! বড় চাচার ছেলে। আমরা একসাথে দশ বছর জিরবাতে ছিলাম। একসাথে স্কুলে গিয়েছি। মসজিদ-মক্তবে গিয়েছি। দাদুর হাতে খাবার খেয়েছি। দাদাজির কাছে বসে গল্প শুনেছি। যায়তুন তুলেছি। বুহাইরা থেকে মাছ ধরেছি। খেজুর গাছে চড়েছি। হুদহুদ পাখির বাসা খুঁজেছি!

-কিন্তু সেসব তো জিরবাতে! এখানে কী মনে করে?

-আমার দাদু ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মহিলা। তিনি বোধহয় আম্মুর দ্বিচারিতার কথা টের পেয়ে গিয়েছিলেন। মেয়েরা এসব দ্রুত টের পায়। কিন্তু কখনো মুখ ফুটে কিছু বলেননি। তিনি চাইতেন সেই ছেলেবেলাতেই আমার আর ভাইয়ার বিয়ে হোক! একবার দাদাভাইকে একান্তে বলেছিলেন। দাদাভাই বলেছিলেন, সময় হলে দেখা যাবে। দাদা-দাদু উভয়েই মারা যাওয়ার পর এ প্রসঙ্গ ধামাচাপা পড়ে যায়। কিন্তু আমরা দুজন কীভাবে যেন দাদুর অভিপ্রায়টা টের পেয়ে গিয়েছিলাম। আম্মুও কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলেন। আমার ভাইয়াকে তিনি একটুও পছন্দ করতেন না।

-কারণ?

-ভাইয়া সেই ছেলেবেলা থেকেই একটু ডানপিটে ধরনের! সাহসী! ধর্মঘেঁষা! ফরাসিবিরোধী দলের সাথেই তার ওঠাবসা!

-আপনার ভাইয়া আমাদের এখানে আছে কি না ঠিক এখনই আমরা বলতে পারছি না। তবে যদি আপনার কথার সাথে মিলে যায়, তাকে কিছু বলতে হবে?

-কেন, দেখা হওয়া সম্ভব নয়?

-নাহ! আপনি এখন বড় হয়েছেন! আপনার ভাইয়ের সাথে দেখা করার সুযোগ নেই। আমাদের এখানে নিয়ম হলো নারী ও পুরুষ আলাদা আলাদা আবাসনে থাকা। তবে কিছু বিবাহিত দম্পতিও এখানে আছে! তারা অবশ্য একসাথে থাকে! এখানে আমাদের বেশির ভাগ সময় মাটির নিচে থাকতে হয়। স্বাভাবিক জীবন বলতে যা বোঝায়, তা এখানে নেই। আচ্ছা, বৈঠক আপাতত এখানে মুলতবি রইল! আমরা খোঁজখবর করে দেখি!

-২-

-জি, আপনার ভাইয়াকে পাওয়া গেছে! তার এখানকার নাম আবুল ওয়ালিদ! সে আপনার সাথে কথা বলতে আগ্রহী নয়। আর আপনার ব্যাপারে আমাদেরও সতর্ক থাকতে বলেছে!

-আমি তার মনোভাব বুঝতে পারছি! তার রাগ করে থাকাটা স্বাভাবিক! কিন্তু আমি মনে করি, আমি একবার সরাসরি কথা বলতে পারলে তার ভুল ভাঙাতে সক্ষম হবো!

-কিন্তু আপনি ইসরায়েলের পক্ষ থেকে প্রেরিত হননি, এর প্রমাণ কী?

-আচ্ছা ধরে নিলাম, আমি ইসরায়েলের পক্ষ থেকে এসেছি! কিন্তু তাদের কাছে কীভাবে খবর পৌঁছাব?

-খবর পাঠানোর মাধ্যমের অভাব আছে? এমনও তো হতে পারে, আপনার শরীরের কোথাও সূক্ষ্ম কোনো চিপস প্লান্ট করা থাকতে পারে। হয়তো এতক্ষণে আমাদের অবস্থানও লোকেট করা হয়ে গেছে!! নয়তো আপনি মোসাদের সুইসাইড স্কোয়াডের সদস্য! এক সদস্যবিশিষ্ট সার্জিক্যাল সুইসাইড মিশনে পাঠানো হয়েছে!

-আপনাদের এই সন্দেহের সন্তোষজনক উত্তর আমার কাছে নেই! তবুও আমি ভাইয়ার কাছে একটা শেষবারের মতো একটা অনুরোধ পাঠাতে চাই! তিনি জান্নাতবাসী দাদুর ইচ্ছাপূরণে রাজি কি না, এ মর্মে হ্যাঁ বা না একটা উত্তর দেবেন আশা করি! ভাইয়াকে আরেকটা কথাও স্মরণ করিয়ে দেবেন, একটা মেয়ে আগ বাড়িয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিলে, বাহ্যিক কোনো সমস্যা না থাকলে, প্রস্তাব গ্রহণ করা নবীওয়ালা কাজ! মুসা আ.-এর ঘটনাই এর প্রমাণ!

-আপনাকে একটা কথা বলা হয়নি! আপনার সাথে তাঁর দেখা না করার বিশেষ একটা কারণ হলো, তিনি একটা গুরুত্বপূর্ণ মিশনের চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রস্তুতিতে রয়েছেন! এমন সঙ্গিন সময়ে তিনি ভিন্ন কিছু ভাবতে চাচ্ছেন না।

-তবুও একটি বারের জন্যে হলেও তার সাথে আমাকে কথা বলার সুযোগ করে দিন। যতদূর জানি, এটা শরীয়তসম্মতও বটে! বিয়ের আগে অন্যের উপস্থিতিতে ছেলে-মেয়ের একবার মুখোমুখি হওয়ার নিয়ম রয়েছে। তারপরও যদি তিনি রাজি না হন, তাকে এই চিরকুটটা দেবেন! এটা দাদুর হাতের লেখা! মারা যাওয়ার আগে তিনি আব্বুকে দিয়ে গিয়েছিলেন। এই চিরকুটে তিনি অল্পকথায় অনেক কিছু বলে গেছেন। ভাইয়া দাদুকে তার মায়ের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন! আশা, তিনি এটা অবহেলা করবেন না।

***

কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতিক্রমে দুজনের মুখোমুখি হওয়ার ব্যবস্থা করা হলো।

-এমন দুঃসাহস তুমি কীভাবে করলে?

-তুমি কি আমাকে ভীতু মনে করেছ?

-এই দেখো, শুরুতেই আগের মতো ঝগড়া শুরু করে দিলে!

-তুমি খোঁচা দিয়ে কথা বললে, উত্তর দিতে হবে না!

-খোঁচা কোথায় দিলাম?

-এই যে আমাকে ভীতু মনে করেছ!

-আচ্ছা, সাহসী মেয়ে! বলো তো, এভাবে বিরাট এক মরুভূমির মতো বিরান এলাকা থেকে আমাকে খুঁজে বের করার দুর্মতি তোমার কী করে হলো! বেঘোরে মারা পড়তে পারতে, অন্য কোনো দলের হাতে পড়তে পারতে! আমাদের দলের সাথে কাকতালীয়ভাবে তোমার দেখা নাও হতে পারত!

-দেখা না হলে, একা একাই সিনাইয়ে ঘুরে বেড়াতাম!

-ও তোমার পূর্বপুরুষদের মতো!

-এ্যাই! ভালো হবে না বলছি! আমি ইহুদী নই! আমাকে ইহুদী বলার অপরাধে, দাদু তোমাকে একবার মেরেওছিলেন!

-আচ্ছা, ঘাট মানছি! আর বলব না! এখন বলো, আমার কী করণীয়?
-দাদুর চিরকুটটা পড়েছ?
-হুঁ!
-তুমি কি ভুলে গেছ, দাদু গোপনে আমাদের বিয়ে দিয়েছিলেন!
-জানি! কিন্তু সে বিয়ে বৈধ হয়নি! কারণ, বড় চাচ্চু-আব্বু বেঁচে থাকতে, দাদু আমাদের বিয়ে দিতে পারেন না। তার সে অধিকার নেই।
-তুমি কচু জানো! দাদু পরবর্তীতে আম্মুকে না জানিয়ে, আব্বুর সম্মতি নিয়েছিলেন!
-ওরে পাকনা মেয়ে! তলে তলে তো সব খবরই রাখা হয়েছে! তা এতদিন পর বাসি-সংবাদ প্রচারের জন্যেই কি মোসাদ তোমাকে পাঠিয়েছে?
-তুমি আগের মতোই নির্দয় আর বে-রহম রয়ে গেছ!
-আচ্ছা, ভুল হয়ে গেছে! মাফ করো!
-তুমি নাকি গুরুত্বপূর্ণ এক মিশনে যাচ্ছ?
-জি!
-কবে?
-আগামীকাল দিবাগত রাত ভোর চারটায়!
-একটা অনুরোধ কি রাখা সম্ভব হবে?
-বলো!
-বাকি সময়টুকু কি আমরা একসাথে কাটাতে পারি?
-না, সম্ভব নয়!
-ফিরে আসার পর?
-আমি যে কাজে যাচ্ছি, সেখান থেকে কেউ ফিরে আসে না!
-ও! বুঝেছি! আচ্ছা, তোমাকে বাধা দেব না! তবে আমি তোমার বৈধ স্ত্রী, এটা কি মানো?
-কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে! ছোটবেলায় কী হয়েছে না হয়েছে, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই!
-তা হলে? আমি যে তোমার সাথে নিজেকে জুড়তে এতদূর এসেছি!
-তুমি... তুমি...!! আচ্ছা ঠিক আছে দেখছি! দায়িত্বশীলের সাথে কথা বলে দেখি! তবে মনে রাখবে, সময় কিন্তু আগামীকাল রাত তিনটা পর্যন্ত!
-জানি!

-৩-

-তাহারাহ!

-তাহারাহ! আহ! কতদিন পর নামটা শুনলাম!

-তাহারাহ! তুমি তো শুনেছ! তোমাদের জিম্মি করার সংবাদ কায়রোস্থ ইসরায়েলি দূতাবাসে পাঠানো হয়েছে! দাবিকৃত টাকা পেলেই তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে!

-শুনেছি!

-আমাকে বলা হয়েছে, তোমার মতামত জানতে। তুমি চাইলে, এখানে থেকে যেতে পারবে! তবে কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা, তুমি ফিরে যাও!

-তুমি কী বলো?

-আমি তখন থাকব না, সুতরাং তোমার ওপর কোনো সিদ্ধান্ত চাপাতে চাই না!

-তবুও বলো!

-আমিও চাই, তুমি ফিরে গিয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করো! পারলে কিছু করার চেষ্ট কোরো!

-আচ্ছা, ঠিক আছে তা-ই করব! আন্তরিকভাবে চেষ্টা করব!

***

-তাহারাহ, আমাদের আজ রাতের কোনো স্মৃতি তোমার কাছে থেকে গেলে তার নাম আবু বকর বা আয়েশা রেখো! আর এই ছুরিটা তাকে শহীদ পিতা (ইনশা আল্লাহ)-এর পক্ষ থেকে হাদিয়া দিয়ো! বোলো, এই খঞ্জর তার পিতাকে একজন মহান ব্যক্তি উপহার দিয়েছেন!

-মহান ব্যক্তিটা কে?

-আমাদের আমীর! মুমিনদের আমীর!

-আচ্ছা, আমি যদি তোমার সাথে যেতে চাই? এতদিন যেখানেই থাকি, দূর থেকেই তোমার খোঁজখবর রাখার চেষ্টা করেছি! তোমার অগোচরে! এখন আর সরতে মন চাইছে না যে!

-এই দীর্ঘ সময় আমার সংবাদ রেখেছিলে? আশ্চর্য! অথচ আমি তোমার কথা ভেবে ভেবে কত নির্ঘুম রাত ভোর করে দিয়েছি! কোনো হদিস পাইনি!

-আমি চাইনি আমার কারণে তোমার কোনোরকম ক্ষতি হোক! আম্মু টের পেলে তোমার অস্তিত্ব মুছে ফেলতে একমুহূর্ত দ্বিধা করতেন না!

-আমার খবর কীভাবে রাখতে?

-অনেক দূর দিয়ে! জিরবায় থেকে যাওয়া আমার এক ইহুদী বান্ধবীর মাধ্যমে!

-সবই আল্লাহর ইচ্ছা! আর আমি তো ভেবেছিলাম তুমি তেলআবিবে গিয়ে এতদিনে বাচ্চাকাচ্চার মা বনে গেছ!

তাহারাহ! এবার যেতে হয়! বিদায় দাও!

-আমাদের কি আর দেখা হওয়ার কোনো অবকাশই নেই?

-নাহ! কীভাবে?

-এমন কি হতে পারে না, আজ আমিও তোমার সাথেই চলে গেলাম? হাত ধরাধরি করেই ওপারে...?

-অপ্রয়োজনীয় প্রাণ-বিসর্জনের কী দরকার? আর তোমাকে দিয়ে আল্লাহ হয়তো ভিন্ন কাজ নেবেন! ইনশা আল্লাহ!

-তা হলে?

-জান্নাতে! ইনশাআল্লাহ!

জীবন জাগার গল্প : ৬২২

যায়তুনরঙা খুন

-১-

বাসায় শুধু দু-বোন আছে। আম্মু-আব্বু দাওয়াতে গেছেন। রাতে নাও ফিরতে পারেন। এ জন্যে আম্মু বড় মেয়ে নাদাকে এ বাড়িতে থাকতে বলে গেছেন। ছোট মেয়ে লুবনা রাতে একা একা ভয় পেতে পারে। নাদার বাসা বেশি দূরে নয়। মাঝেমধ্যে এমন হয়। আম্মুকে বাইরে রাত কাটাতে হয়। কখনো কখনো দু-তিন রাতও একটানা থাকেন না। আম্মু কী যে করেন সেটাই এখনো মেয়েদুটো উদ্ধার করতে পারেনি। এ নিয়ে দু-বোনের জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। তাদের বাড়িটা ইসরায়েল সীমান্তের কাছাকাছি। লেবাননের শেষ প্রান্তে। বাবা এখানকার একটা জলপাই বাগানের মালিক। সেটা নিয়েই তিনি ব্যস্ত থাকেন। পাশাপাশি অন্য ব্যবসাপাতিও আছে। নিয়মিত বৈরুতেই থাকা হয়। জলপাই তোলার সময় হলে পুরো পরিবার এখানে আসে। এবারও এসেছে।

***

দুইবোন একসাথে হলেই রাজ্যের গল্প এসে ধরা দেয়। বিয়ের আগেও এমন গল্পের আসর বসত। আম্মুর তাড়া খেয়ে ঘুমুতে যেতে হতো। নইলে চুপিগল্পে কত রাত যে ভোর হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। দুজনে কম্বলের নিচে টর্চ জ্বালিয়ে বই পড়ত। একই বই। কে কার আগে পৃষ্ঠা শেষ করতে পারে, এই প্রতিযোগিতা চলত। প্রতিটা অধ্যায় শেষ হওয়ার পর, শুরু হতো নতুন করে গল্প। কে কী বুঝল। কাকে মনে ধরল। কাকে মন ছাড়ল। নিজের স্বপক্ষে যুক্তি দিতে দিতে যখন আর কথা খুঁজে পেত না,

তখন আবার বইয়ে ডুব দিত। এভাবে কখন যে জলপাই বাগান থেকে পাখির কিচিরমিচির সুর আসতে শুরু করত, খেয়াল থাকত না। পাখির ডাকে সম্বিত ফিরে পেয়ে গুটিসুটি মেরে ঘুমিয়ে পড়ত। আম্মু একটু পরেই সেই ম্যারাথন ডাক শুরু করবেন।

***

আপুর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর, লুবনা বড্ড একা হয়ে পড়েছে। বই পড়ার গতি কমে গেছে। তবুও নাদা আগের মতোই কেনার সময় প্রতিটি বই দুই কপি করে কিনে আসে। এ নিয়ে আম্মুর গজগজ লেগেই আছে।

-আরে বাপু! একই বই দুই কপি না কিনে, এ টাকা দিয়ে আরেকটা নতুন বই কিনলেই তো আরেকটা বই সংগ্রহে জমা হয়! শুধু শুধু টাকার অপচয়!

-সে তুমি বুঝবে না!

-আমার অত বুঝে কাজ নেই।

***

আপু আগের মতো বই পড়ার প্রতি আগ্রহী নয়। তর্কও তেমন জমে না। জোরাজুরিতে বই হাতে নিলেও, কতক্ষণ পর পর হাই তোলে। ঘড়ি দেখে। উঠে গিয়ে জামাইকে ফোন করে। ধ্যাৎ, এভাবে পড়া হয়? এতই যদি স্বামীর জন্যে দরদ, তা হলে এলে কেন? আমি একা থাকতে ভয় পাই? আপুটা দিন দিন আম্মুর মতো কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। আগেও ছিল, ইদানীং ব্যাপারটা একটু বেশি বেশিই ধরা পড়ছে। এই তো কাল রাতেও আপুর সাথে তুমুল তর্ক বেঁধে গেল। তার কথা হলো, এভাবে নিজের শরীরে বোমা বেঁধে মরে যাওয়ার মধ্যে কোনো বীরত্ব নেই। এটা কাপুরুষতা। নিরীহ ইহুদী মেরে সন্ত্রাসীদের কী লাভ?

–আপু, তুই কাদের নিরীহ বলছিস? তারা যখন জোর করে বসতি স্থাপন করতে যায়, হাজার বছর ধরে বাস করতে থাকা মানুষকে নিজের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে নিজেরা দখল করে নেয়। এটা কি কোনো সভ্যসমাজ মেনে নেবে?

–আচ্ছা, তা হলে ক'দিন আগে বৈরুতে গাড়ি বোমা হামলার কথা তুই কী বলবি? এখানে কি কোনো জবর-দখলের ঘটনা ফাঁদবি?

–কারা হামলাটা করেছে, সেটা দেখতে হবে। জানতে হবে কেন করেছে।

বোঝার ব্যাপার হচ্ছে, টার্গেট কারা ছিল? কেন তারা টার্গেট ছিল? এসব প্রশ্নের উত্তর কি তুই খুঁজে দেখেছিস আপু?

–তোর কাজ খালি প্যাঁচ কষা। সবকিছুতে রহস্য খুঁজে বেড়াস। সেই ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি, সন্ত্রাসীদের প্রতি তোর বেশ ঝোঁক। কেন রে? তারা তো আমাদের শত্রু।

–আমাদের মানে কাদের?

–আমরা যারা ইহুদী আছি, তাদের!

–আচ্ছা আপু একটা কথার জবাব দিবি?

–কোন কথা?

–আমাদের আব্বু কি মুসলমান ছিলেন না?

–হুঁ ছিলেন হয়তো!

–তা হলে আমরা ইহুদী কেন?

–আম্মু ইহুদী বলে আমরাও ইহুদী!

–আরেকটা কথাও তোর কাছে জানার ছিল। কিন্তু তুই বোধহয় প্রশ্নটা শুনে রেগে যাবি, তাই করছি না। পরে সময়-সুযোগ বুঝে করব।

–এখনই বলে ফেল না, এত ভণিতা করছিস কেন?

–নাহ পরে বলব। শুধু একটু ইশারা দিয়ে রাখি; আমাদের আব্বুর মৃত্যুটা কি স্বাভাবিক ছিল?

–উনি গাড়ি-দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন। আম্মু তা-ই বলেছেন।

–সেটা আমিও জানি। তোকে একটা কথা কখনো বলিনি। আজ বলেই ফেলি। ভবিষ্যতে আর বলার সুযোগ পাব কি না জানি না। আমাদের মেডিক্যাল কলেজের লাইব্রেরিতে নিয়মিতই যাই। একবার কয়েক দিন ধরে একই বই পড়ছি। চতুর্থ দিন বইটা উল্টে দেখি, ভাঁজ করা চিরকুট। তাতে ভয়ংকর একটা বাক্য লেখা!

–কী লেখা?

–লেখা ছিল—*তোমার আব্বুর গাড়ি-দুর্ঘটনার জন্যে তোমার মা দায়ী।*

–কী আজগুবি কথা! অসম্ভব! এ হতেই পারে না। এটা কখনকার ঘটনা?

–বেশ আগের!

-তুই এতদিন এত বড় একটা সংবাদ আমার কাছে চেপে গেলি যে? আম্মুকে বলেছিলি?

-নাহ, বলে কী হবে? ঘটনা যদি সত্যি হয়, আম্মু বুঝি স্বীকার করবেন? আর যদি মিথ্যে হয়, ভুয়া সংবাদকে গুরুত্ব দেয়ার কী প্রয়োজন?

-তুই দেখি বেশ চাপা হয়ে উঠেছিস! আগে তো এমন ছিলি না! না জানি আরও কত ঘটনা তুই চেপে আছিস!

-আপু, তুই কাউকে এ কথা বলবি না!

-আচ্ছা। লুবনা, সত্যি করে বল তো, আমার কেন যেন সন্দেহ হচ্ছে তুই চিরকুটের কথাটা বিশ্বাস করেছিস! ঠিক বলেছি না?

-কোনো কারণ ছাড়া শুধু শুধু একটা বেনামি চিরকুটের কথা কেন বিশ্বাস করতে যাব?

-তুই কথা ঘোরাচ্ছিস! আমার সন্দেহ হচ্ছে। আচ্ছা আজ এই প্রসঙ্গ থাক! এখন ঘুমা।

***

নাদা পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল। লুবনার চোখে ঘুম নেই। ছোটবেলা থেকেই দেখেছে, আম্মু কখনোই আব্বুর প্রসঙ্গ তোলেন না। কোনোক্রমে উঠলেও, তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলে ফেলেছেন। তার মধ্যে আব্বুর প্রতি কেমন যেন একটা অবজ্ঞার ভাব। অথচ নানুর কাছে শুনেছে, আম্মু সবার অমতেই আব্বুকে বিয়ে করার জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছিল। তা হলে মৃত স্বামীর প্রতি এমন শীতল মনোভাব সন্দেহ উদ্রেক করে বৈকি! কিন্তু কার কাছে যে সঠিক সংবাদ পাবে? বিশেষ করে চিরকুটটা পাওয়ার পর থেকেই, তার মনটা আরও বেশি খুঁতখুঁতে হয়ে উঠেছে। তার খালি মনে হচ্ছে, তা হলে আব্বু সম্পর্কে সবকিছু জানে এমন একটা পক্ষ বৈরুতে আছে। এবং তারা আমাদের সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবরও রাখে। এবং আমি যে আপু ও আম্মুর চেয়ে কিছুটা ভিন্ন সে খোঁজও রাখে।

***

ঘুম না আসায় লুবনা বাইরের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। আকাশে চাঁদ আছে। জোছনার আলোতে সামনে বিশাল এলাকা জুড়ে জলপাই বাগান দেখা যায়। হালকা কুয়াশায় ঢাকা পুরো বাগানের পাতাগুলো চাঁদের

আলোয় চিকচিক করছে। অনেক রাত। চারদিক নিস্তব্ধ। খুট করে একটা আওয়াজ হলো। ঘোর ভেঙে গেল লুবনার। অবাক হয়ে দেখল, দুজন লোক তাদের উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে। দুজন বলা ভুল হবে, একজন আরেকজনকে প্রায় কাঁধে করে নিয়ে এসেছে। বেশ অবাক হলো। এত রাতে এরা কোত্থেকে এল? কী চায়? তার ভয় লাগার কথা, কিন্তু একটুও ভয় লাগছে না। ভয় চাপিয়ে কেমন যেন কৌতূহল জেগে উঠল। কাছে গিয়ে গ্রিলের ভেতর থেকেই প্রশ্ন করল :

-কে আপনারা? কী চান?

-আমরা বিপদে পড়ে এসেছি। আমার সঙ্গী মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। তার রক্তক্ষরণটা বন্ধ করা দরকার।

লুবনা একজন 'প্রায়-ডাক্তার'। তার কর্তব্যবোধ জেগে উঠল। আবার চিন্তাও হলো, সম্পূর্ণ অপরিচিত দুজন মানুষকে সে কীভাবে বিশ্বাস করবে? আম্মু নেই! আপুও ঘুমে! তাকে জাগাব? নাহ থাক! আপুকে জাগালে তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলবে। চিৎকার দিয়ে উঠবে। সাথে সাথে চারদিকে ফোন করে সরগরম করে ফেলবে। থানা-পুলিশও করে ফেলতে পারে। বিচিত্র কিছু নয়। আচ্ছা! দেখাই যাক না, এদের দেখতে সত্যিকারের অসহায় বলেই মনে হচ্ছে।

***

লুবনা দৃঢ়পায়ে এগিয়ে গেল। দরজা খুলে বাইরে এসে দুই আগন্তুকের কাছাকাছি গেল।

-আপনারা?

-ব্যান্ডেজ বাঁধার মতো কিছু হবে?

-কী হয়েছে?

-আমার বন্ধুর পায়ে গুলি লেগেছে।

লুবনা গুলি লাগার কারণ জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও থেমে গেল। একটু ভেবে বলল :

-গুলিটা কি আছে না বেরিয়ে গেছে?

-থেকে গেছে।

-তা হলে তো আগে ওটা বের করতে হবে।

-না, আমাদের হাতে অত সময় সময় নেই। দিনের আলো ফোটার আগেই এখান থেকে সরে পড়তে হবে।

-এই অবস্থায় কীভাবে যাবেন? আপনার বন্ধু তো প্রায় অচেতন।

-কিন্তু আমাদের উপায় নেই। যেভাবেই হোক সরে পড়তে হবে!

-আচ্ছা আসুন!

লুবনা লোক দুজনকে বাড়ির পেছন দিকে, জলপাই বাগানের ভেতরে একটা কুঠুরিতে নিয়ে তুলল। আহতকে খাটিয়ার ওপর শুইয়ে দিয়ে বলল :

-আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আমি প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে আসছি।

***

অনেক কষ্টে গুলিটা বের করা গেছে। প্রচণ্ড কষ্ট হয়েছে আহত মানুষটার। কী আর করা, ওরা হাসপাতালে যেতে রাজি নয়। আর হাসপাতাল এখান থেকে অনেক দূরে! এত রাতে সেটা খোলা থাকে কি না সেটাও সন্দেহ। আপাতত বিপদ কেটে গেছে! সুস্থ যুবক পরিচয় দিল।

–আমার নাম আহমাদ আর ও হামযা। যদি কিছু মনে না করেন, আমরা দুজন মুসলমান বলে, আপনার মনে প্রশ্ন জাগাই স্বাভাবিক! আমরা কেন এসেছি, কীভাবে এসেছি!

–থাক, এসব পরেও জানা যাবে। আপাতত আপনাদের দুজনের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা যায় কি না দেখি।

–আপনি আর কষ্ট করতে যাবেন না। আমরা চলে যাব।

–আপনি পারলেও, উনি কীভাবে পারবেন? আমি বলি কি—আপনারা দুজনেই এখানে রাতটুকু থেকে যান। আমার গলায় স্টার অব ডেভিড দেখে যদি ইহুদী মনে করে, নিরাপত্তাহীনতা বোধ কল্লেন, তা হলে বলব, আমার দিক থেকে আপনাদের কোনো ভয় নেই।

–ঠিক আছে, হামযা থাকুক! আমাকে যেতেই হবে।

আহমাদ দ্রুত অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। হামযা তখনো বেহুঁশের মতো হয়ে আছে। লুবনা হামযাকে একটা কম্বল দিয়ে ঢেকে ঘরে ফিরে এল। এতক্ষণে তার মাথায় এল, কাজটা কি ঠিক হলো? চেনা নেই জানা নেই, সম্পূর্ণ অপরিচিত দুই যুবককে এভাবে আশ্রয় দিয়ে সে ভুল করে ফেলল না তো! দেখলেই বোঝা যায়, এরা কোনো গোপন কাজ করতে গিয়ে

আহত হয়েছে। এবং সেটা সীমান্তেই কোথাও হয়েছে। পরদিন খুব ভোরেই আম্মু ফিরে এলেন। বেশি উত্তেজিত অবস্থায়। একটু পর আব্বু ফিরলেন। চারদিকে কেমন যেন চাপা উত্তেজনা। পুলিশ এল। তারা এদিক সেদিক খোঁজ করে চলে গেল। তারপর এল সামরিক বাহিনীর লোকেরা। তারা বেশ লম্বা সময় ধরে তল্লাশি চালাল। বাসায় এসেও কথা বলে গেল। আম্মুই তাদের সাথে কথা বললেন। লুবনা তখনো ঘুমে। পরে আপুর কাছেই সে বিস্তারিত শুনেছে। তার বুকটা ধক করে উঠল! নিজেকে ফাঁদে পড়া প্রাণী বলে মনে হলো। লোকটা কি এখনো কুঠুরিতে আছে? তার হুঁশ ফিরে এসেছে? বাইরের অবস্থা কি টের পেয়ে গেছে? তার সাথী কী যেন নাম? ও আহমাদ! তার কী খবর? গন্তব্যে পৌঁছতে পেরেছিল? এখন সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে কীভাবে কুঠুরিতে যাওয়া যায়?

***

সুযোগ এল। একটু পর আপু বাসায় চলে গেল। আম্মুও একটা ফোন আসার পর কোথায় যেন গেলেন। এই সুযোগ, লুবনা চুপিচুপি কুঠুরিতে গেল। মানুষটা খাটিয়ার ওপর বসে আছে।

-আপনার ঘুম ভাঙল কখন?

-একটু আগে! আহমাদ কোথায়? আমি কি রাতে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলাম?

-আহমাদ বলেছে আবার আসবে। জি, আপনি বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন। আর ঘুমের ওষুধও খাওয়ানো হয়েছিল। যাতে ব্যথায় ঘুমটা ভেঙে না যায়।

-বাইরে কি সামরিক বাহিনীর কোনো গাড়ি এসেছিল? আওয়াজ শুনলাম?

-জি। তারা কী যেন খুঁজছে।

-আপনি তাদের দেখেছেন?

-জি না। তারা খুব ভোরে এসেছিল। আমি তখন ঘুমে ছিলা[illegible]। নিন আপনি মুখ-হাত ধুয়ে নিন। কুঠুরির ওপাশেই সবকিছু আছে। [illegible]া আমাদের বাগানের পাহারাদারের ঘর। সে এখন বাড়িতে। এখা[illegible] একটা লাঠি আছে। আপনি সেটাতে ভর দিয়ে বাথরুমে যেতে পারবে[illegible] [illegible]নের বেলা কোনো সমস্যা হবে না। রাতে আপনাকে অন্ধকারে থাক[illegible] হবে। বাতি জ্বাললে ধরা পড়ে যাবেন। আম্মু অত্যন্ত কড়া ইহুদী। আব্বু[illegible]ষ্টান।

-আপনি?

-আমি? বাবার দিক থেকে মুসলিম। মায়ের দিক থেকে ইহুদী!

-বাবা না খ্রিষ্টান বললেন?

-আমার আপন আব্বু মারা গেছেন সেই ছেলেবেলায়। বর্তমানে যাকে আব্বু ডাকি, তিনি আম্মুর দ্বিতীয় স্বামী। আপনার ব্যান্ডেজটা খুলে আবার বাঁধতে হবে। কাল রাতে ওষুধ না থাকায় ঠিকমতো বাঁধা হয়নি। আজ শহরে গিয়ে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র নিয়ে আসব।

-একটা খটকা ছিল।

-বুঝতে পেরেছি! আমি একজন ইহুদীকন্যা হয়ে আপনাকে কেন সাহায্য করলাম?

—জি।

—এর উত্তর আমি পরে দেব! শুধু এটুকু বলুন, আপনাদের কাজটা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ছিল তো?

—অবশ্যই! এবং অত্যন্ত সফল! জানি না আপনাকে এভাবে বলা ঠিক হচ্ছে কি না। আবার মিথ্যা বললেও আপনি ধরে ফেলবেন। আমাদের কাজটা হয়ে যাওয়ার পর, অন্যরা জেনে ফেললেও সমস্যা নেই। আর এমনিতেও এতক্ষণে ইসরায়েলি জেনারেলদের আরাম টুটে গেছে।

***

লুবনা চলে গেল। হামযা গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। কারও সাহায্য ছাড়া এখান থেকে সরে পড়া অসম্ভব। নড়াচড়া করাই তো মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাইরের অবস্থা যা মনে হচ্ছে, আহমাদ এখন আসতে পারবে না। আবার এখানে থাকলেও ধরা পড়ে যাওয়ার সমূহআশঙ্কা। একজন বেগানা নারীর সাথে নির্জন প্রকোষ্ঠে কথা বলতে হচ্ছে। তার হাতের সেবা নিতে হচ্ছে। আহমাদ যে আমাকে কোথায় এনে তুলল। কিন্তু পরিস্থিতিই এমন যে, মেনে না নিয়ে উপায় নেই। মেয়েটার বিষয়টাও অদ্ভুত! কেমন যেন অস্বাভাবিক! এতক্ষণেও ধরিয়ে যেহেতু দেয়নি, তা হলে আর দেবে বলে মনে হচ্ছে না। নাকি আহমাদ ফেরার অপেক্ষা করছে। দুজনকে একসাথে ধরিয়ে দেবে। মেয়েটার কাজ দেখে মনে হয়েছে একজন

ডাক্তার। কিন্তু বয়েস তো তা বলে না। মনে হয় এখনো পড়ছে। কিছু সংবাদ জরুরিভিত্তিতে দরকার, এ জন্যে বিশ্বস্ত সোর্স না হলে সঠিক খবর পাওয়া যাবে না। এখন আহমাদ ফেরার অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। সে গতরাতে চলে গিয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। দুজন এক জায়গায় আটকা পড়ে থাকার কোনো মানে হয় না।

***

লুবনা মাকে বলে বের হলো। কিছু জিনিস কেনা দরকার। তার অনেক দিনের সাধ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কিছু করা। ইহুদীদের ধ্বংস দেখা। এমন মানসিকতা দেখে, সে নিজেও মাঝেমধ্যে বেশ অবাক হয়। সে কেন আপুর মতো নিষ্ঠাবান ইহুদী হতে পারল না? তবে কি সে অবচেতন মনে আব্বুকে ভালোবাসে। কিন্তু তার খুব একটা স্মৃতি তো তার মাথায় নেই! নাকি আম্মু সম্পর্কে অভিযোগটা শোনার পর, মানসিকতায় পরিবর্তন এসেছে! এখন প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কেনা যাক। দেখি কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে গড়ায়। গতরাতের দুই যুবককে আল্লাহই পাঠিয়েছেন বোধহয়। এমনিতেই আমাকে পালাতে হতো। আম্মু আর আপু আমাকে বারাকের হাতে গছিয়ে দিতে যেভাবে উঠেপড়ে লেগেছে! বেশিদিন কুলিয়ে ওঠা যাবে না। প্রাণ গেলেও কোনো ইহুদী ব্যাটাকে বিয়ে করব না। আচ্ছা, আম্মুর স্বার্থটা কী? কেন তিনি লেবাননে বসে আমাকে ইসরায়েলে বিয়ে দিতে চাচ্ছেন? তিনি কি সত্যি সত্যি মোসাদের অধীনে কাজ করেন? আমাদের আব্বুর পরিবার-পরিজনের সাথে আম্মু দেখা করতে দেন না কেন? কেন সব সময় আমাকে এভাবে আগলে রাখেন? তবে কি তিনিও সন্দেহ করেন আমাকে? নাকি ভালোবাসার টানেই এসব করেন?

***

হামযা বসে বসে ভাবছে। বাইরে পাতা মাড়ানোর খসখসে আওয়াজ। কেউ আসছে। দ্রুত উঠে উঁকি দেয়ার উপায় নেই। খুট করে দরজা খুলে গেল। ওষুধপত্র হাতে লুবনা। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল হামযা।

-আপনাদের বাড়িতে কেউ থকে না?

-থাকেন। এই মুহূর্তে কেউ নেই।

-আমার এখানে থাকা নিরাপদ নয়। গতরাতে বাধ্য হয়ে এখানে আসাটা বোধহয় আল্লাহরই ইচ্ছা। নইলে ধরা পড়ে যেতাম। কিন্তু এখনো নিরাপদ নয়। একটু আগে দূর থেকে বেশ কিছু মানুষের হৈ চৈ শুনতে পেয়েছি। গলার আওয়াজে মনে হয়েছে, তারা কাউকে খুঁজছে।

-ওটা রুটিন চেক। বাগানে একবার অনুসন্ধান হয়েছে তো, আর আসবে না। আর আমাদের বাসার দিকে কেউ ভুলেও আসবে না। আম্মুই আসতে দেবেন না। কারণ, এদিকে কেউ আসতে পারে, তা কারও কল্পনাতেও আসবে না। আপনি নিশ্চিত থাকুন।

-কোনোভাবে কি আমাকে এখান থেকে বের হওয়ার রাস্তা করে দেয়া যায়? আপনি কি আহমাদের সাথে একটু যোগাযোগ করতে পারবেন? তার একটা নম্বর আমার কাছে আছে। অবশ্য সেটা সরাসরি তার নম্বর নয়। অন্য কারও! তবে ভীষণ জরুরি পরিস্থিতি দেখা দিলে, নম্বরটা ব্যবহার করা যাবে। অন্য কেউ ধরবে, তবে আহমাদের কাছে সংবাদ পৌছবে।

–আচ্ছা, সব ব্যবস্থা হবে। আপনি সুস্থ হলে আমিও আপনাকে গাড়িতে করে শহরে পৌছে দিতে পারব। কিন্তু এখন সবাই একজন আহত ব্যক্তিকে খুঁজছে। বের হওয়া নিরাপদ নয়। তার চেয়ে ভালো হবে, সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় থাকা। আগামী আরও সপ্তাহখানেক আপনি এই ঘরে নিরাপদ। এদিকে কেউ আসবে না।

-যদি কিছু মনে না করেন, আপনার পুরো ব্যাপারটা কি খুলে বলা যায়?

-কোনটা?

-ওই যে বললেন, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কিছু করতে চাওয়া?

-আজই বলতে হবে?

-না না, তা নয়। কিন্তু সবটা শুনতে পারলে ভাবতে সুবিধে হতো। একা একা বসে থেকে তো কোনো কাজ নেই! আর যদি সম্ভব হয় একটা কুরআন কারীম এনে দিতে পারবেন?

-পারব! আমাদের বাসাতেই আছে! আব্বুর সবকিছু সরিয়ে ফেললেও কিছু জিনিস রয়ে গেছে। আম্মু ভুলে হোক বা ইচ্ছায়, সেসব ফেলে দেননি। তবে অবশ্য কুরআন কারীমটা আব্বুর কি না, সেটা আমি নিশ্চিত নই। আম্মু হয়তো আমাদের গুদামঘরে একটা ভাঙা স্যুটকেসে সেটা দেখেছি। আম্মু হয়তো জানেন না।

-আপনার মরহুম আব্বু সম্পর্কে আমার বেশ কৌতূহল হচ্ছে।

-আম্মু চলে আসবেন। পরে এসে বিস্তারিত বলব। গত কিছুদিন ধরে আমি গোপনে আব্বু সম্পর্কে খোঁজখবর করতে শুরু করেছিলাম। তাতে একটা বিষয় পরিষ্কার, তিনিও আপনাদের মতো ইসরায়েলবিরোধী কোনো কার্যক্রমের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন।

-২-

বিশেষ কোনো কারণে, ইসরায়েল সীমান্তে বেশ তৎপরতা দেখা গেল। লুবনার আম্মুও বেশ ব্যস্তসমস্ত সময় পার করলেন। জলপাই-মৌসুম শেষ হয়ে আসায়, আব্বুও এবারের মতো এখানকার পাট চুকাতে ব্যস্ত। কয়েকদিন পর বৈরুতে ফিরে যেতে হবে। আপু অবশ্য এখানেই থাকবেন। হামযা আগের চেয়ে এখন কিছুটা সুস্থ। তবে পা'টা এখনো হাঁটা-চলার উপযোগী হয়নি। লুবনা বলেছে :

-সমস্যা নেই। আমরা চলে গেলে, আহমাদ এসে আপনার দেখাশোনা করতে পারবে। অথবা অন্য কোথাও নিয়ে যেতে পারবে। ততদিনে চারদিকে তল্লাশির মাত্রাও কমে আসবে। আমরা বৈরুত চলে গেলে, এদিকটা এমনিতেই জনশূন্য হয়ে পড়ে। বাগান-পাহারাদার থাকলেও, বাগানের দিকে খুব একটা আসে না। আসার প্রয়োজনও পড়ে না। আসবেই বা কেন, বাগানে পাহারা দেয়ার মতো কিছু নেই যে। আর তার কাজ বেশি থাকে শহরে। যায়তুন তেলের কারখানায়। সে শুধু রাতের বেলাতেই ঘুমুতে আসে।

***

লুবনার আচরণে নাদার মনে কিছু একটা সন্দেহ জেগেছিল। আগে আম্মু না থাকলে হুটহাট বোনের কাছে চলে যেত বা বোনকে ডাকিয়ে আনত। কয়েক দিন ধরে কী হলো মেয়েটার? সারাক্ষণ একা একা থাকে? ব্যাপারটা অস্বাভাবিকই বটে। জিজ্ঞেস করাতে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে সে! আম্মুকে জিজ্ঞেস করে দেখতে হবে। আপু প্রশ্ন করার পর, লুবনা সতর্ক হয়ে গেল। পারতপক্ষে বাগান-কুঠুরির দিকে পা বাড়াল না বড় একটা। বেশি করে শুকনো খাবার আর ওষুধ-পথ্য একবারেই দিয়ে এল। আহমাদের সাথে

যোগাযোগ করা দরকার। তার দীর্ঘদিনের সুপ্ত বাসনা, ইসরায়েলবিরোধী মুসলিম কোনো দলের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা। মায়ের কড়া নজরদারি, বাবার নিবিড় তত্ত্বাবধান, আপুর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের কারণে সুযোগ হয়ে উঠছিল না। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেই সুযোগটা এসে গেল। যদিও এখনো পর্যন্ত দুই যুবকের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেনি। তবুও তাদের হাবভাব থেকে যতটুকু আঁচ করা গেছে তাতে মনে হয়েছে, কাঙ্ক্ষিত যোগসূত্র সে পেয়ে গেছে। এটাকে কাজে লাগাতে হবে। ছিন্ন হতে দেয়া যাবে না। যত ঝুঁকিই থাকুক! বৈরুত যাওয়ার আগেই যা করার করতে হবে।

***

সারাদিন কুরআন কারীম তিলাওয়াত করেই সময় কাটে হামযার। রাত হলে একটু কষ্ট হয়। বাতি জ্বালানো যায় না। প্রথম প্রথম সমস্যা হতো। আস্তে আস্তে সয়ে গেছে। মুখস্থ তিলাওয়াত আর যিকির করে সময় কাটে। গত অভিযানের আগে এভাবে কত রাত পার করতে হয়েছে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে! এখানে মশার কামড় নেই, পোকার দংশন নেই, সীমান্তে তো মশা-পোকা ছাড়া আরও কত কত ভয়-শঙ্কা নিয়ে গুঁড়ি মেরে পড়ে থাকতে হয়েছে! সুযোগের অপেক্ষায়। ইসরায়েলি সৈন্যগুলো বেজায় ভীতু! পোস্ট ছেড়ে একটুও বাইরে আসতে চায় না। শুধু প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য বাধ্য হয়ে, এ ঘর থেকে ও ঘরে যাওয়ার সময় সামান্য সময়ের সুযোগ পাওয়া যায়। অল্প সময়েই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফায়ার করতে হয়। ময়দানে থাকলে সময়গুলো কীভাবে যেন কেটে যায়। টেরও পাওয়া যায় না। সারাক্ষণ উত্তেজনায়ময় প্রতীক্ষার কারণেই বোধহয় এমনটা হয়ে থাকে। মনোযোগ কেন্দ্রীভূত থাকে দূরের একটা পোস্টের দিকে। তাই অন্য দিক নিয়ে ভাবার ফুরসতই মেলে না। কিন্তু এই বদ্ধ কুঠুরিতে কোনো কাজ নেই। পায়ে সমস্যার কারণে ইচ্ছেমতো নড়াচড়ারও সুযোগ নেই। তাই হাঁপ ধরে যায়। এ ধরনের আটকে পড়া সময়ের করণীয় সম্পর্কেও ট্রেনিংয়ে বলা হয়েছিল। সেই শিক্ষাটা এখন কাজে লাগছে।

***

আম্মু আজও বাইরে থাকবেন। সুযোগটা কাজে লাগাতে হবে। অনেক কাজ, আহমাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। সে জন্যে শহরে যেতে হবে। অপরিচিত কোনো নম্বর থেকে ফোন করতে হবে। আবার নিজের বাসস্থানের আশেপাশে থেকেও ফোন করা যাবে না। নইলে বিপদ হতে পারে। হামযা বার বার সতর্ক করে দিয়েছে। ব্যান্ডেজ পরিবর্তন করার সময় হয়ে গেছে। লুবনা মনে মনে একটু দ্বিধান্বিত! আজ কয়েক দিন যেতে পারেনি। মানুষটা একা একা কী করছে কে জানে! খাবার-দাবারের সমস্যা হওয়ার কথা নয়। শুকনো খাবার খেতে খেতে অরুচি না ধরলেই হয়। এ ধরনের খাবারে তো তারা অভ্যস্ত হওয়ার কথা।

***

হামযার একটু ঝিমুনি ভাব এসেছিল। গত রাতে পায়ে কিচকিচে ব্যথা উঠেছিল। ঘুম আসেনি। ব্যান্ডেজের ভেতরে ইনফেকশন হয়ে গেল কি না! খুলে দেখা জরুরি হয়ে পড়েছে। লুবনাকে খবর পাঠানোরও কোনো ব্যবস্থা নেই। আজও না এলে, ঝুঁকি নিয়ে বাইরে যেতে হবে। পা হারিয়ে ফেলা কাজের কথা নয়। একবার ময়দানের মেহনতে অংশ নেয়ার পর পঙ্গু হয়ে ঘরে বসে থাকার কষ্ট যে কী, ভুক্তভোগীরা ছাড়া বুঝবে না। আধো ঘুম আধো জাগরণে এসব ভাবছিল। দরজার খুট করা আওয়াজে চটকা ভেঙে গেল। চমকে উঠে তাকাতেই সামনে জীবন্ত আশা আর প্রত্যাশার প্রতিচ্ছবি হয়ে লুবনা দেখা দিল। মনে হলো কত দিন পর দেখা! তার সাথে কত দিনের পরিচয়!

-দুঃখিত! আসতে দেরি হয়ে গেল। আসার সুযোগ হচ্ছিল না। আপু সন্দেহ করেছিলেন। আম্মুও আমার আচরণে অস্বাভাবিকতা আঁচ করেছিলেন। মুখ ফুটে কিছু না বললেও বুঝতে পেরেছিলাম, সুযোগ পেলে আমাকে নিয়ে বসবেন।

-না না, আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হবেন না। সব ঠিকঠাক মতোই ছিল। খাবার যা আছে, এক মাস চলে যাবে। শুধু...!

-শুধু কী!

-পা'টাতে কেমন যেন ব্যথা টের পাচ্ছি।

–তাই নাকি! দেখি দেখি!

যত্ন করে ড্রেসিং করে দিল লুবনা। ক্ষতস্থান শুকিয়ে আসছে তো, তাই ব্যথা করছে। আরও একদিন ব্যথাটা থাকতে পারে। তারপর ঠিক হয়ে যাবে।

-আমার স্থানান্তরের কোনো ব্যবস্থা হয়েছে?

-ব্যবস্থা করা যাবে। তবে আমার মনে হয়, এই কুঠুরিই বেশি নিরাপদ। শহরে গোয়েন্দা গিজগিজ করছে। এ বাড়িকে কেউ ঘুণাক্ষরেও সন্দেহের আওতায় ফেলবে না।

-আপনারা চলে গেলে?

-সে যখন যাই তখন দেখা যাবে। একটু কিছু ব্যবস্থা হয়েই যাবে। আমরা চলে গেলেও, আপনি আরও কিছুদিন থেকে যেতে পারবেন। যদি ইচ্ছে হয় আরকি!

-আপনার আব্বু সম্পর্কে পরে জানাবেন বলেছিলেন।

-জি। গত কয়েক দিনে নতুন অনেক কথা জানতে পেরেছি আব্বু সম্পর্কে। আম্মু সেটাই টের পেয়ে গেলেন কি না, কে জানে!

-কী জেনেছেন?

-আপনাকে সেই রহস্যময় চিরকুটের কথা বলেছিলাম। দ্বিতীয় আরেকটা চিরকুট পেয়েছি কয়েক দিন আগে। বলা হয়েছিল, কলেজ ছুটির পর নির্দিষ্ট একটা স্থানে গিয়ে দাঁড়াতে। যদি আব্বু সম্পর্কে আমার জানার আগ্রহ থাকে তবেই। সময়মতো গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম। একটা গাড়ি এল। পেছনের আসনে একজন মধ্যবয়স্ক মহিলা বসা ছিলেন। সামনে চালকের আসনে একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষ। ভদ্রমহিলা আমাকে উঠে বসতে ইশারা দিলেন। একটু দ্বিধা হলেও, সেটা ঝেড়ে ঝটিতি উঠে পড়লাম। মানুষটা আমাকে বড় আপনজনের মতো জড়িয়ে ধরলেন। সবার কথা এক এক করে জানতে চাইলেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম, আমার ও আমার পরিবারের সবার সম্পর্কে তার জানাশোনা দেখে! থাকতে না পেরে প্রশ্ন করলাম :

-আপনি এত কিছু কীভাবে জানেন? আপনি কে?

-আমি তোমার ফুপু! সামনের জন তোমার ফুপা। এবং তোমার বাবার ছেলেবেলার বন্ধু। আজীবনের সাথী। সব কাজের ঘনিষ্ঠ সহচর।

-আপন?

-জি।

-কই? আম্মু এ বিষয়ে কখনোই কিছু বলেননি?

-সে জানে না। ইয়াসিন তাকে আমার কথা বলেনি। তোমার আম্মুও আমাদের পরিবার সম্পর্কে তেমন আগ্রহ দেখায়নি। বিয়ের সময় অবশ্য আমরা লেবাননে ছিলামও না। অনেক দিন পর এসেছি। তবে যেখানেই থেকেছি, তোমার সংবাদ নিয়মিত নিয়েছি। তোমার আব্বুই বলে গিয়েছিলেন।

-আব্বু বলে গেছেন? সেটা কেন?

-তিনি মারা যাওয়ার আগে বিভিন্ন কারণে বুঝতে পেরেছিলেন তাকে মেরে ফেলা হতে পারে, তাই! কিন্তু হত্যাকারী যে তার একান্ত আপন কেউ হবে, তিনি সেটা নিশ্চিত হতে পারেননি। সন্দেহ করতেন!

-একান্ত আপন বলে কি আপনি আম্মুকে বোঝাচ্ছেন?

-লুবনা মা! এ বিষয়টা আপাতত থাক! পরে আসবে বিষয়টা। আগে-পরের সব ঘটনা জানার পর, তুমি নিজেই হিশেব মিলিয়ে নিতে পারবে।

-আপনি কি আমাকে সব ঘটনা খুলে বলতে পারেন?

-বলছি। তোমার দাদু মানে আমাদের আম্মু ছিলেন ফিলিস্তিনি। আমাদের আব্বু ছিলেন লেবানিজ। ফরাসিবিরোধী জিহাদে তিনি প্রথম সারির মুজাহিদ ছিলেন। আরব-ইসরায়েল যুদ্ধেও তিনি ইজ্জুদ্দীন কাসসাম রহ.-এর সাথে জিহাদে অংশ নিয়েছিলেন। যুদ্ধে গিয়েই তিনি দাদুকে বিয়ে করে নিয়ে আসেন। সে থেকেই আমাদের পরিবার ফিলিস্তিনের হিতাকাঙ্ক্ষী। আব্বু উচ্চশিক্ষিত আলেম ছিলেন। আমাদেরও শিক্ষা দিতে কসুর করেননি। তোমার আব্বু ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতেও পড়াশোনা করেছে। সেখানেই মূলত তোমার মায়ের সাথে প্রথম দেখা। তোমার আম্মু ভার্সিটিতে খ্রিষ্টান পরিচয়ে ভর্তি হয়েছিল। একই ডিপার্টমেন্টে পড়াশোনা করার কারণে, নিয়মিতই দেখা হতো। কথা খুব একটা হতো না। তোমার আব্বু ছিলেন রক্ষণশীল মানসিকতার মানুষ। তার ওপর বাবা-মায়ের গভীর একটা প্রভাবও কাজ করত। আসলে সে মেয়েদের নিয়ে ভাবার সময়ই পেত না। তার ভাবনা-চিন্তার ধরনটাই ছিল ভিন্ন রকমের।

-ভিন্ন রকমের মানে, ব্যাখ্যা করা যাবে?

-ভাইয়া ছিলেন আব্বুর মতাদর্শে লালিত পুরুষ! আবার মায়ের কারণে ফিলিস্তিনিদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার। বায়তুল মুকাদ্দাসই ছিল তার সব সময়ের চিন্তা। প্রথম দিকে তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। লেবাননে ইখওয়ানের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। অবশ্য কখনো দলীয় পদের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেননি। কিন্তু দলের জন্যে কাজ করে যেতেন রাত-দিন। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতেন। ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্যে যা যা করা দরকার, সবই করতেন। আশ্রয় শিবিরগুলোতে দিনের পর দিন পড়ে থাকতেন। ইয়াসির আরাফাতের সাথেও তিনি কাজ করেছেন। মতের মিল না হওয়াতে, ভিন্ন পথ ধরেছিলেন।

-মতের অমিল কেন?

-ইয়াসির আরাফাত আরব শাসকদের ওপর বড় বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। তোমার আব্বুর কথা ছিল, আরব ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির পর, মিশরের মতো অন্য দেশগুলোও মৌনভাবে ইসরায়েলকে মেনে নিয়েছে। তাদের কাছ থেকে বেশি কিছু আশা করা বোকামি! আরাফাত এসব পরামর্শে কান দেননি। এর মধ্যেই ইসরায়েল লেবাননে অভিযান চালাল। এরিয়েল শ্যারনের নেতৃত্বে। গণহত্যা চালানো হলো সাবরা-শাতিলা আশ্রয়শিবিরে। ইসরায়েলকে সাহায্য করেছিল, খ্রিষ্টান ফ্যালাঞ্জিস্ট মিলিশিয়ারা। তোমার আব্বু এই খ্রিষ্টান ও ইহুদীবিরোধী একটা সশস্ত্র মুজাহিদ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন। শাতিলা ক্যাম্পে আটকে পড়া অসহায় মানুষগুলোকে বাঁচানোর জন্যে একটা দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনা করা হয়। অবশ্য খ্রিষ্টানদের গাদ্দারীর কারণে সেটা সফল হয়নি। ইসরায়েলি বাহিনী তুমুলভাবে বোমা নিক্ষেপ আর গুলিবর্ষণ করতে শুরু করে। তোমার আব্বু দেখলেন, এভাবে যুদ্ধ চালিয়ে গেলে, মুসলমানই মারা পড়বে বেশি। তাই পিছু হটার সিদ্ধান্ত নিলেন। এ সময়ই তোমার মায়ের দেখা পেলেন। রাস্তার ওপর পড়ে আছেন। তার গাড়ির চালক মারা গেছেন ইসরায়েলি শেলের আঘাতে। তোমার মাও রক্তাক্ত! তাকে ধরাধরি করে নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে আসা হলো। হাসপাতালে স্থানের সংকুলান না হওয়াতে মুজাহিদদের বিশেষ মেডিক্যাল ক্যাম্পে তার ঠাঁই হলো।

***

ভার্সিটিতে ছিল মৌখিক পরিচয়। এখন সে পরিচয়ে যোগ হলো কৃতজ্ঞতা। তোমার মায়ের আগ্রহেই বিয়েটা হয়। সে নিজে থেকেই মুসলমান হয়েছিল। আব্বু-আম্মু অবশ্য তখন বেঁচে নেই। আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। আমি তখন স্বামীর সাথে বিদেশে। বিয়ের আগে তোমার মায়ের মনের অবস্থা কেমন ছিল বলতে পারব না। কিন্তু বিয়ের পর প্রথম দিকে সে সত্যি সত্যি মুসলমান হয়েছিল বলেই মনে হয়েছে।

-তা হলে সমস্যা বাঁধল কখন?

-এর মধ্যে আফগানিস্তানে রাশান আগ্রাসন শুরু হলো। আরব থেকে দলে দলে যুবক সেখানে যাচ্ছে। তোমার আব্বুও সেখানে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। স্ত্রীকে বিশ্বাস করে নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথাও বললেন। তিনি আফগানিস্তান থেকে ফিরতে পারলে, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সে অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারবেন। তোমার আম্মু বিষয়টা মেনে নিতে পারল না। কিন্তু স্বামীকে ঠেকিয়ে রাখার মন্ত্রও তার জানা ছিল না। তিনি চলে গেলেন। এরই মধ্যে তোমরা দুজন পৃথিবীতে চলে এসেছ। তোমার আব্বুর অনুপস্থিতিতে, সে স্বরূপে ফিরে এল। জানা গেল, সে জন্মগতভাবেই একজন ইহুদী। সাময়িক মতিভ্রমের কারণে তোমার আব্বুকে বিয়ে করেছিল। এখন পরিবারের চাপে তার মনোভাব বদলে যেতে শুরু করল। তার পরিবার লেবাননের প্রাচীন অধিবাসী হলেও, ইসরায়েলের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই তাদের পরিবার, তেলআবিবের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। সেখানকার গোয়েন্দাদের আনাগোনা তাদের পরিবারে লেগেই ছিল। সে সুবাদে তোমার আম্মুও তাদের আনঅফিশিয়াল কর্মী ছিল। তার দায়িত্ব ছিল ভার্সিটির ছাত্রদের ওপর নজর রাখা। তাদের মধ্যে ইসরায়েলবিরোধী কোনো দল তৈরি হচ্ছে কি না, সেদিকে নজর রাখা।

-আপনি এসব কথা কীভাবে জেনেছেন?

-তোমার ফুপার মাধ্যমে।

-তিনি কীভাবে জানলেন?

-সেটা তোমায় বলা যাবে না। তবে তোমাকে আমাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে ডকুমেন্টস দেখাতে পারব। তোমার মায়ের কয়েকটি গোপন বৈঠকের অডিও টেপ শোনাতে পারব। একটা ভিডিও দিতে পারব।

-আম্মু কি তা হলে আব্বুকে হত্যা করার জন্যে আর তার ওপর নজর রাখার জন্যই বিয়ে করেছিল?

-আমার তা মনে হয় না। তোমার আব্বুর প্রতি তার ভালোবাসাটা খাঁটিই ছিল। সে হয়তো খাঁটি মুসলমানই হতে চেয়েছিল। কিন্তু তাকে ভয় দেখানো হয়েছিল। ব্ল্যাকমেইল করা হয়েছিল। স্বামী ও সন্তান, কোনো একটাকে বেছে নিতে বলা হয়েছিল। আর মুসলিম বিয়ে করার শাস্তিস্বরূপ স্বামীকে মারার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।

-আব্বু কীভাবে মারা গিয়েছিলেন?

-গাড়িবোমায়?

-বোমাটা কি আম্মুই গাড়িতে রেখেছিলেন?

-না। অন্য কেউ রেখেছিল। তবে তোমার আম্মুর সেটা জানা ছিল। অন্তত আমরা এমনটাই জানি।

-এটা কখনকার ঘটনা?

-তোমার আব্বু আফগানিস্তান থেকে ফেরার পর। আর কিছুদিন সময় পেলে, তোমার আব্বু ইসরায়েলের বিরুদ্ধে বড় ধরনের একটা অভিযান পরিচালনা করতেন। মোসাদ সেটা আগাম জানতে পেরেই তাঁকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে। আমাদের ধারণা মোসাদ তোমার মায়ের কাছ থেকেই তোমার বাবার গতিবিধির তথ্য সংগ্রহ করত।

-আব্বুকে ভালোবাসলে, আম্মু কেন গোপন সংবাদগুলো বাইরে পাচার করত?

-মোসাদ তাকে পরের দিকে লোভী করে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। বুঝিয়েছিল, তুমি আমাদের কথামতো কাজ করলে তোমার কোনো কিছুরই অভাব হবে না। টাকা-পয়সা, বাড়ি-গাড়ি!

-কিন্তু তার মনে মুসলমানদের প্রতি এত বিদ্বেষের কারণ কী?

-কোনো কারণ নেই। তোমার বাবার মৃত্যুর পর, সে অনেক দিন পর্যন্ত মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন ছিল। তখন তাকে গোপন কোথাও নিয়ে চিকিৎসা করা হয়। সুস্থ হয়ে ফিরে আসার পর থেকেই সে অন্য মানুষ।

-মানে চিকিৎসার নামে আম্মুর মন-মানসিকতাই বদলে দেয়া হয়েছে।

-হুঁ। এমনই কিছু হবে।

-আব্বুর কবর কোথায়?

-সেখানেই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি!

***

বাবার কথা বলতে বলতে লুবনার চোখ দিয়ে টপটপ পানি পড়তে শুরু করল। গলাটা বুজে এল। হামযা চুপ করে থাকল। লুবনাকে কাঁদার সুযোগ করে দিল।

-আপনার ফুপুর সাথে যোগাযোগ করার কোনো উপায় আছে?

-জি আছে। নম্বরটা মুখস্থ করে রেখেছি। আমার ফুপাও ইসরায়েলবিরোধী কিছু একটার সাথে জড়িত আছেন। আব্বুর গড়ে তোলা সেই দলের কয়েকজন আজও জীবিত আছেন। আমি তাদের সাথেও দেখা করার চিন্তা করেছি। আব্বু সম্পর্কে আমি আরও বেশি করে জানতে চাই। সময়-সুযোগ করে, আম্মুর সাথেও কথা বলব। আমি আব্বুর মতো হতে চাই।

-প্রথম রাতে আমি আপনার গলায় স্টার অব ডেভিড দেখে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম।

-আম্মু ছোটবেলা থেকেই আমাদের এটা গলায় ঝোলাতে বাধ্য করে এসেছেন। আপু অবশ্য পরম যত্নে এটা গলায় পরে। আমার কাছে এটা কখনোই ভালো লাগেনি। আচ্ছা, আপনারা এখানে কীভাবে এলেন? যাচ্ছিলেনইবা কোথায়?

-আমি এসেছি জর্দান থেকে। আহমাদের বাড়ি এখানে। আমি বৈধভাবেই লেবাননে এসেছি। আমার কাজ ছিল লেবানন দিয়ে ইসরায়েলে যাওয়ার সহজ কোনো পথ আছে কি না, সেটা খুঁজে দেখা।

-৩-

এদিকের সব কাজ মোটামুটি গুছিয়ে এসেছে। ঠিক হলো দুদিন পর সবাই বৈরুত চলে যাবে। সেনাকর্ডন আর খানাতল্লাশিও বন্ধ হয়ে গেছে। পরিস্থিতি আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। নাদার বাসায় সবার দাওয়াত। আব্বু-আম্মু চলে গেছেন। লুবনা পরে যাবে বলে থেকে গেছে। পরে আর সুযোগ নাও পাওয়া যেতে পারে। শেষ বারের মতো দেখা করতে হবে। অনেক কথা, অনেক কাজ বাকি। তার করণীয় কী হতে পারে, সেও তাদের কোনো কাজে আসতে পারে কি না, জানতে হবে। কিন্তু তার সাথে যদি আর দেখা না হয়? না না, এমনটা হতে দেয়া যাবে

না। আব্বুর প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে, তার সুবিচার আমি চাইতেই পারি। মেয়ে হিশেবে আমার কিছু করার অধিকার আছে। আপুর বাসায় একেবারে না যেতে পারলেই ভালো হতো। আম্মু আর আব্বুর মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ চলছে। আজ সেটার ফয়সালা হওয়ার সম্ভাবনা। আপু আম্মুর পক্ষে, দুলাভাই আব্বুর পক্ষে। দু-পক্ষেরই হাতেই পাত্র প্রস্তুত। বলতে গেলে, উভয় পাত্রই ফেলে দেয়ার মতো নয়। আম্মু চান আমাকে ইহুদী পাত্রের হাতে সঁপতে। আব্বু চান খ্রিষ্টানের কাছে। যে যার স্বার্থ নিয়ে বিভোর। আমাকে এই ফাঁদ থেকে বেরোতে হবে। তৃতীয় কোনো বিকল্প বের করতে হবে। অতি তাড়াতাড়ি। কিন্তু সেটা কী? আব্বুর হত্যাকাণ্ডে খ্রিষ্টান ফ্যালাঞ্জিস্টরা যেমন ছিল, ইহুদী কানেকশনও ছিল।

***

হামযা এখন রাতের বেলায় বাইরে হাঁটতে বেরোয়। চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। লাঠিতে ভর দিয়ে। রাত গভীর না হলে বের হওয়া নিরাপদ নয়। অন্ধকারে হাঁটাচলা নিরাপদ নয়, এই ভাঙা পা নিয়ে। কিন্তু বসে থাকতে থাকতে চিন্তাও যেন বসে যায়। জমাট বেঁধে যায়। মাথাকে সচল রাখতেই ফুসফুসের মুক্ত বাতাস প্রয়োজন হয়। রাতের বেলা জলপাই গাছের ছায়ায় হাঁটতে হাঁটতেই মাথায় একটা চিন্তা এল। লুবনা এলে বলে দেখতে হবে। মেয়েটাকে ঠিকমতো এখনো বোঝা হয়নি। ইহুদী, মুসলিম না খ্রিষ্টান? মুসলমান যে নয়, সেটা পরিষ্কার। অন্তত বেশভূষায়। অন্তরে হয়তো মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি আছে। এটা বাবার কারণে হতে পারে। অথবা সহানুভূতির চেয়ে আরও বেশি কিছু আছে, আমি বুঝতে ভুল করেছি। এবার এলে সবকিছু পরিষ্কার করে নিতে হবে। অবাক করা ব্যাপার হলো, মেয়েটা আমাদের কী মনে করে আশ্রয় দিল? সে কি এমন কিছুর জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল? কথায় কথায় একবার বলেছিল :

-যেসব মুসলিম যুবক দুঃসাহসিক কাজে অংশ নেয়, তাদের তার ভালো লাগে। এ নিয়ে আপুর সাথে তার ঝগড়াও হয় নিয়মিত!

***

আব্বু-আম্মু বেরিয়ে যেতেই লুবনা চলে এল। হাতে সময় খুবই কম। দ্রুত কথা সেরে আপুর বাসায় যেতে হবে। খাওয়া-দাওয়া সেরে সম্ভব হলে

আগেই ফিরে আসতে হবে। হামযার কাছে একটা পিস্তল ছিল। সেটাই খুলে পরিষ্কার করছিল। লুবনার পায়ের আওয়াজ পেয়ে চট করে সরিয়ে রাখল। পিস্তলটা চূড়ান্ত মুহূর্তের সঙ্গী। কেউ ধরতে এলে, অসহায়ের মতো ধরা দিতে হবে না। কয়েকজনকে নিয়ে মারা যাবে। তেমন পরিস্থিতি বোধহয় আপাতত আর দেখা দিচ্ছে না। তবুও সাবধানের মার নেই। আহমাদ বুদ্ধি করে পিস্তলটা রেখে যাওয়াতে তার প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। দরজা খুলতেই একরাশ আলোয় যেন ঘরটা হেসে উঠল। হামযার মনে হলো আলোটা পার্থিব নয়। অপার্থিব কিছু। লুবনাকে আজ বেশ চটপটে মনে হচ্ছে। কোথাও যাবে মনে হয়। বাইরে বের হওয়ার পোশাক পরেই এসেছে। তবে কি তারা চলে যাচ্ছে?

-আজই বৈরুত চলে যাচ্ছেন?

-না, যাচ্ছি আপুর বাসায়। তবে দু-দিন পর চলে যাব। সবাই যাবে। আপুও আমাদের সাথে যাবে। বাগানের প্রহরী আপুর বাসা পাহারায় থাকবে। এদিকটা একদম ফাঁকা হয়ে যাবে। ভালোই হবে।

-আহমাদের সাথে যোগাযোগ হয়েছে?

-জি। আমরা চলে গেলেই আপনাকে নিতে আসবেন! তার সাথে দেখা হলো না।

-আপনাকে একটা কথা বলার ছিল! কীভাবে যে বলি! আপনারা চলে গেলে, এই বাসা তো একদম খালিই পড়ে থাকে!

-জি।

-আমরা কি এই কুঠুরিটা আরও কয়েক দিন ব্যবহার করার অনুমতি পেতে পারি?

-সেদিনের কথা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। আপনি জর্দান থেকে এসেছেন বলেছিলেন। আরও বিস্তারিত কি বলা সম্ভব? যদি খুলে বললে, আপনার বা আপনাদের কোনো সমস্যা না থাকে তা হলে আমার উপকার হতো।

-কিছু মনে করবেন না, আপনার কেমন কাজে লাগবে সেটা কি একটু খুলে বলতে পারেন?

-আমি বলেছিলাম আব্বুর কথা। আমিও আব্বুর মতো হতে চাই। তিনি যে পথে জীবন ব্যয় করেছেন, আমিও সে পথকে বেছে নিতে চাই!

-আপনার আব্বু সম্পর্কে কি আরও বিস্তারিত জানা সম্ভব?

-জি। আপনাকে আমি ফুপার সাথে কথা বলিয়ে দিতে পারব। ফুপাও আপনাদের মতোই বোধহয়। যদিও তিনি এ ব্যাপারে আমাকে কিছু বলেননি। তবে আমি আঁচ করতে পেরেছি।

-আপনাকে সব খুলে বলা ঝুঁকি, কিন্তু আপনি যেহেতু আমাকে সুযোগ পেয়েও ধরিয়ে দেননি, তাই আপনাকে কিছুটা বিশ্বাস না করে উপায় নেই। আমার বাড়ি আম্মান থেকে একটু দূরে। গ্রামের নাম যারকা। আমার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ইরাকে মার্কিন বিমান-হামলায় শহীদ হয়েছিলেন। তার শাহাদাতের পর, আমাদের গোটা এলাকায় বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। জর্দান সরকার অবশ্য তার নাগরিকত্ব বাতিল করেছিল এবং আমার ওই ভাইয়ের জর্দানী স্ত্রী 'উম্মে মুহাম্মাদ'-এর ওপর নির্যাতন চালাতে শুরু করেছিল। সরকারের এই আচরণ আমরা মেনে নিতে পারছিলাম না। মার্কিন সরকারও আমাদের ভাইকে ধরিয়ে দেয়ার জন্যে বিরাট অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। সে এক লম্বা কাহিনি। সরকারের আচরণ ও মার্কিন-ইসরায়েলি আগ্রাসনের কারণে, আমাদের যারকা গ্রামের মানুষেরা ফুঁসে উঠেছিল। মুরুব্বিরা বুদ্ধি করে সবাইকে থামালেন। পরামর্শ করে ভেবেচিন্তে কাজ আগানোর কথা বললেন। যুবকশ্রেণি মেনে নিল। আমাদের পাঠানো হয়েছিল সিরিয়াতে। সেখান থেকে আবার জর্দানে। তারপর এবার লেবাননে।

-এখানে কেন?

-ফিলিস্তিনে প্রবেশের রাস্তা খোঁজা! পাশাপাশি একটা লিংক তৈরি করার জন্যে। আমাদের ভাইয়া তিনটে বিয়ে করেছিলেন। তার মধ্যে একজন ফিলিস্তিনি ছিলেন। এই ভাবির এক আত্মীয়ের মাধ্যমে আমরা ইসরায়েলের ভেতরের খবরাখবর পেতাম। সেই ভাইটি বলেছিলেন, তিনি লেবানন সীমান্ত দিয়ে কিছু সহযোগিতা করতে পারবেন। সে জন্যই আমাকে আর আহমাদকে পাঠানো হয়েছিল।

-দেখা হয়েছিল?

-জি।

-তারপর?

-আমরা কথা শেষ করে স্থান ত্যাগ করতে উদ্যত হওয়ার আগমুহূর্তেই আকস্মিক হামলার শিকার হলাম। ফিলিস্তিনি ভাইটি সাথে সাথে শহীদ হয়ে গেলেন। আমি আর আহমাদ গুলি করতে করতে পিছু হটলাম। তবে তিনজন ইসরায়েলি সেনাকে পড়ে যেতে দেখেছি।

-এটা ইসরায়েলের ভেতরে?

-জি না। লেবানন সীমান্তের ভেতরে।

-পায়ে গুলি লাগল কখন?

-লুকিয়ে রাখা গাড়িতে ওঠার সময়।

-ওরা আমাদের সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভেতরে এসেছিল?

-জি।

সময় শেষ হয়ে এসেছে। লুবনা হাতঘড়ি দেখে আঁতকে উঠল।

-আমাকে একটু পরে যেতেই হবে। নইলে আপু ফোন করবে। এমনিতেই আপু সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছে আমাকে। তা হলে বৈরুতে দেখা হবে!

-হতেও পারে।

-তার মানে নিশ্চিত নন?

-কীভাবে বলি! আমাকে তাড়াতাড়ি জর্দানে ফিরে যেতে হবে। সংবাদটা পৌঁছাতে হবে।

-আমি যেতে পারব?

-কোথায়?

-জর্দানে?

-জর্দানে? কেন?

-আচ্ছা থাক! আমি যাই। আমার নম্বরটা আহমাদের কাছে আছে! লেবানন ত্যাগ করার আগে যদি প্রয়োজন মনে করেন, মেসেজ দেবেন। আমিই কল করব।

***

আপুর বাসায় লুবনা হাঁপাতে হাঁপাতে পৌঁছল । সবাই তার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। খাবার প্রস্তুত। টেবিলে বসে সে চমকে উঠল। আম্মু আর আপু যুক্তি করে তাদের পছন্দের পাত্রকেও হাজির করেছে। খাওয়ার

ইচ্ছেটাই মরে গেল। তবুও ভদ্রতা রক্ষা করার জন্যে বসতে হলো। না বসলে খারাপ দেখায়। আপু মনে ব্যথা পাবে। আম্মু রেগে যাবেন। আব্বু অবশ্য মনে মনে খুশিই হবেন। বাইরে হয়তো চোটপাট দেখাবেন। খাবার শেষ হলো। খেতে খেতে টুকিটাকি আলাপ হলো। সৌজন্য-বিনিময়মূলক। অরালের সাথে আগেও একবার দেখা হয়েছিল। আম্মুই কারসাজি করে দুজনকে মুখোমুখি করিয়ে দিয়েছিলেন। অনাকাঙ্ক্ষিত মুহূর্তটা শত চেষ্টাতেও এড়ানো গেল না। খাবার শেষ হতেই আপু এসে বলল,

-লুবনা, তুই একটু অরালের সাথে কথা বলবি!

-আমার ইচ্ছে করছে না।

-ছেলেটা তোর সাথে কথা বলার জন্যে উন্মুখ হয়ে বসে আছে।

-আমি কি তাকে বসতে বলেছি? আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা না জেনেই তোমরা কেন আগ বাড়িয়ে তাকে দাওয়াত দিতে গেলে! এ জন্যেই আমি আজ আসতে চাইনি।

-আহ, দেখা করলেই কি বিয়ে করে ফেলতে হবে?

-তুমি আমাকে কখনো ছেলেদের সাথে কথা বলতে দেখেছ? এসব আমার কাছে ঘৃণা লাগে! তুমি জেনেশুনেও কেন আমাকে বিব্রত করছ?

-আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে! তুই সব সময় মুসলিম যুবকদের কথা বলিস। তাদের বিভিন্ন কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করিস। আচ্ছা বল তো, তুই ভেতরে ভেতরে ওদের দলে নাম লিখিয়ে ফেলিসনি তো?

-আমাকে আমার মতো করে বাঁচতে দাও!

-আম্মু ব্যাপারটা সহজভাবে নেবেন না।

-কেন নেবেন! অরাল তো তারই একান্ত অনুচর!

-কী বলতে চাস তুই!

-বলতে চাই, আম্মু আমাদের লুকিয়ে কী করেন জানো?

-জানি! তিনি একজন প্রকৃত ইহুদীর মতো ইসরায়েলের পক্ষে কাজ করেন।

-আর অরাল হলো এই কাজের সহযোগী।

আহমাদ এল গাড়ি নিয়ে। গভীর রাতে। কুঠুরিটার প্রতি মায়া পড়ে গেছে। এতদিন ছিল, মায়া লেগে যাওয়াই স্বাভাবিক। বের হওয়ার আগে হামযার মনটা কেমন দুলে উঠল! কেন? হামযা তো অবাক! এমন হওয়ার কারণ? কী যেন এখানে ফেলে যাচ্ছে! বুকের কোথাও চিনচিনে ব্যথাও হচ্ছে! এমন অনুভূতির আগে কখনো হয়নি তো! আহমাদকে বলল বিষয়টা! আহমাদ শুনেই মিটিমিটি হেসে বলল,

-ব্যথা? তা তো হবেই! ব্যথার ওষুধ যে এখানে থেকে যাচ্ছে!

-দুষ্টুমি রাখো! ওসব কিছু নয়। যোগাযোগ হয়েছে?

-হুঁ। তোমাকে ফিরে যেতে বলেছেন।

-বৈরুতে একটু যাওয়া দরকার!

-কেন?

-ওখানে কিছু মানুষ আছেন। তাদের সাথে কথা বলতে পারলে, নতুন অনেক কিছু জানা যাবে। ভবিষ্যতে কাজের সুবিধার্থে।

-তাদের ঠিকানা জানা আছে?

-জি না। লুবনা কিছু ভেঙে বলেনি।

-মেয়েটা খুবই বুদ্ধিমতী!

-কীভাবে বুঝলে?

-মনে হচ্ছে, তোমার কাছ থেকে অনেক কথাই আদায় করেছে, কিন্তু তার দিক থেকে তুমি একটা ঠিকানা আদায় করে রাখতে পারনি।

-তুমি কি তাকে সন্দেহ করো?

-উঁহু! একদম না। তাকে প্রথম দেখেই বুঝেছি, এই মেয়ে ভিন্ন ধাতে গড়া। গড়পড়তা মেয়ের চেয়ে আলাদা।

-বাব্বাহ! জহুরির চোখ!

-না, তা নয়। আমি এ ধরনের অভিযানে আরও বের হয়েছি। মানুষ চেনাটা আমার জন্যে জরুরি। কারণ, এ লাইনে চট করে মানুষকে মাপতে না পারলে, বেশিদিন টেকা যাবে না।

-লুবনা বলেছে, তোমার কাছে তার নম্বর আছে! প্রয়োজন হলে যোগাযোগ করতে।

-আচ্ছা, আচ্ছা! মেয়েটা আসলেই ব্যতিক্রমী। সে একটা মেসেজ দিয়ে গেল।

-কী মেসেজ!

-বলে গেল, তুমি চলে যাওয়ার আগে, তার সাথে একটু যোগাযোগ না করে যেন লেবানন ত্যাগ না করো।

-এটা সরাসরি বললেই তো পারত!

-তুমি যতটা বুদ্ধু সে ততটা শুদ্ধ! তাই বলেনি। খেলো হতে চায়নি। তোমার ঘটে কতটুকু কী আছে সেটাও যাচাই করার ব্যবস্থা করল।

-তবে তুমি যা-ই বলো আহমাদ! মেয়েটা বোধহয় আমাদের কাজে লাগবে। ইহুদী ঘরের সন্তান, অথচ চিন্তাধারা পুরোপুরি মুসলিমের মতো। তার মূল পিতা ছিলেন মুসলিম। তার সাথে কোনো স্মৃতি নেই, তবুও মনের গভীরে ইসলাম-প্রেম ডালপালা মেলে আছে।

***

বৈরুতে লুবনার ফুপার সাথে দেখা হলো। তিনি সমমনা আরও কিছু মানুষের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সবার সাথে না হলেও বাছাই করা কয়েকজনের সাথে দেখা হলো। কথা হলো। অতি সংগোপনে। ফুপা বললেন :

-তোমরা চাইলে আমরা লেবানন সীমান্তের কাছাকাছিতে থাকা ইসরায়েলি সীমান্তরক্ষীদের সমস্ত পোস্টের অবস্থান জানাতে পারি। বিস্তারিত বিবরণসহ।

-ম্যাপ এঁকে দেয়া সম্ভব?

-পরিপূর্ণ ম্যাপই আমাদের কাছে আছে। এমনকি শিফট বদলের সময়-ক্ষণসহ। লোকবল থাকলে, একসাথে দশটা পোস্টে হামলা করা সম্ভব। তবে হামলাগুলো করার পর, নিরাপদে বেরিয়ে আসা অসম্ভব!

-বেরিয়ে আসার প্রয়োজন হবে না। যারা যাবে, তারা ফিরে আসার জন্যে যাবে না। আমি জর্দান গিয়ে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব। আপনি সম্ভব হলে আরও কিছু তথ্য জোগাড় করতে পারেন কি না দেখুন। ইনশা আল্লাহ খুব তাড়াতাড়ি কেউ না-কেউ আপনার সাথে দেখা করার জন্যে আসবে। আপনার সাথে আগে দেখা হলে, আমাদের কষ্ট অর্ধেক কমে যেত!

-আল্লাহই তোমাদের লুবনার কাছে নিয়ে গেছেন! আমি কল্পনাও করতে পারিনি, লুবনা এতটা তৈরি হয়ে ছিল। আমি তো তাকে ইহুদী মায়ের সন্তান হিশেবেই জানতাম। তবে একটু অন্য রকম ভাবতাম। এর বেশি কিছু নয়। কিন্তু এখন দেখছি সে আমাদের চেয়েও অনেক এগিয়ে! এটা কী করে সম্ভব হলো? সত্যি অবাক করা ব্যাপার! অথচ সে ইসলামধর্ম পালন করে এমনও নয়।

আহমাদ এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার সে মুখ খুলল :

-আল্লাহ সবাইকে সুবুদ্ধি দান করেন। সেটা কেউ কাজে লাগাতে পারে, কেউ পারে না। লুবনার ক্ষেত্রেও এমনটাই হয়েছে। তার বিবেক ও বিচার বুদ্ধি অত্যন্ত স্বচ্ছ আর নিরপেক্ষ।

-তা হলে আরেক বোনের অবস্থাও লুবনার মতো হলো না কেন?

-এটাই আল্লাহর কুদরত। তাকদীরের ফয়সালা আর সত্যকে জানার ও গ্রহণ করার আগ্রহ। বাবা একজন মুসলমান জানার পরও তার মধ্যে কোনো ভাবান্তর তৈরি হয়নি। লুবনা তার বাবার কথা শুনেছে, দেখেনি। কিন্তু নাদা ছেলেবেলায় বাবার আদর-যত্ন সামান্য হলেও পেয়েছে। অথচ সে মায়ের আদলকেই মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছে। তাদের বাবা ছিলেন সত্যিকারের সাহসী পুরুষ!

***

বৈরুতে ফেরার পর, লুবনা বেশ কয়েক বার ফুপুর সাথে দেখা করেছে। কথা বলেছে। সরাসরি না বললেও ফুপুকে সে আকারে-ইঙ্গিতে বলেছে, একজন মুসলিম যুবককেই সে স্বামী হিশেবে পেতে চায়। ফুপু কৌতূহলী হয়ে জানতে চেয়েছিলেন :

-তুমি কি নির্দিষ্ট কারও কথা বলছ?

-সেটা এখন বলব না! শুধু এটুকু বলব, আপনি আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য না করলে, আমার একার পক্ষে অগ্রসর হওয়া সম্ভব না। কোনো মুসলিম যুবককে বিয়ে করব, এমন চিন্তার কথাও যদি আম্মু-আব্বু-আপু জানতে পারে, তা হলে তুলকালাম কাণ্ড বেঁধে যাবে। এমনকি প্রাণ-সংশয় পর্যন্ত দেখা দিতে পারে। আমার এবং 'তার'। কি জানি, আম্মুই হয়তো

আমাকে হত্যার ব্যাপারে সায় দেবেন! তিনি তো ইহুদীবাদ নিয়ে এতটাই বুঁদ!

-মা, তুমি একদম চিন্তা কোরো না। আল্লাহই একটা ব্যবস্থা করে দেবেন। তিনি সবকিছু জানেন। বোঝেন। দেখেন।

***

হামযা আর আহমাদ আসার পর, ফুপু বুদ্ধি করে লুবনাকেও আসার জন্যে খবর দিলেন। আলাপ-আলোচনার শেষের দিকে লুবনা এসে ঘরে প্রবেশ করল। ফুপু এসে বললেন :

-লুবনা একটা বায়না ধরেছে।

ফুপা বললেন :

-কী বায়না?

-সে একটু জর্দান যেতে চায়! ওখানে গেলে সে হামযার সাহায্য আশা করতে পারে কি না, একটু জানতে চায়!

হামযা সাথে সাথে বলে উঠল,

-অবশ্যই সাহায্য করব! তাকে সাহায্য করা তো আমার ঈমানী দায়িত্ব। কিন্তু কী ধরনের সাহায্যের প্রয়োজন হবে তার?

-সে একজন মানুষের সাথে দেখা করতে ইচ্ছুক।

-তার কোনো আত্মীয়?

-না না। একজন মহিলা। তোমার কাছেই নাকি তার কথা শুনেছে। তোমার এক বোন।

-ও হো! উম্মে মুহাম্মাদ!

ফুপা জানতে চাইলেন :

-উম্মে মুহাম্মাদ কে?

-এক শহীদের স্ত্রী।

-শহীদ? কে?

-আহমাদ ফাদেল নাযাল রহ.।

-আচ্ছা বুঝতে পেরেছি! যারকাবী রহ.।

ফুপু ইশারায় ফুপাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। একটু পরে ফুপা ফিরে এসে বললেন :

-হামযা, তোমাকে একটা কথা বলার ছিল।

-জি বলুন।

-তুমি লুবনাকে কেমন মেয়ে বলে মনে করো?

-আমার দেখা সেরা মেয়ে। যদিও আমি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের বাইরে কোনো মেয়েকে জানা বা চেনার সুযোগ পাইনি। শুধু একটা ব্যাপারে ঘাটতি আছে!

-সেটা কী?

-সে এখনো প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেনি।

-ও! সেটা যেকোনো মুহূর্তে হতে পারে। হামযা, আমি কেন লুবনা সম্পর্কে জানতে চেয়েছি! তুমি কি বুঝতে পেরেছ?

-জি!

-তুমি তার সাথে একটু কথা বলবে?

-জি! এমন সুযোগ করে দিলে কৃতজ্ঞ থাকব! আমি আসলে তার যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারিনি! বুঝতেও পারিনি!

***

হামযা বসে বসে ঘামছে। আগে কুঠুরির দেখাগুলো ছিল বাধ্য হয়ে। অপারগ অবস্থায়। দেখা না করে বিকল্প কোনো উপায় ছিল না। এবার সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে দেখা করতে বসে আছে। একটু একটু লজ্জাও লাগছে। কীভাবে কথা শুরু করবে! এটা তো একধরনের ইন্টারভিউ। দুজনের জীবন এক সুতোয় গাঁথার প্রথম পদক্ষেপ। লুবনা এসে সালাম দিল। আগে তো কখনো সালাম দেয়নি। হামযা অবাক হয়ে সালামের উত্তর দিল। মনে মনে ভাবল, তবে কি সে ভেতরে ভেতরে মুসলমান?

-আপনি তো দেখা না করেই চলে যাচ্ছিলেন।

প্রথমেই সম্পূর্ণ ভিন্ন দিক থেকে আক্রমণ আসাতে হামযা বিহ্বল হয়ে পড়ল। তার মানে কি আহমাদের কথাই ঠিক? আমি আসলেই বোকা! লুবনার সাথে দেখা করার তো কোনো প্রয়োজন ছিল না। দেখা না করেই

চলে যাওয়া যেত। এখন লুবনার গলার স্বরে আবেগ-অভিযোগ আর অভিমান টের পেয়ে বুঝতে পারল, দেখা না করে যাওয়াটা হতো বিরাট বড় ভুল। মাথা তুলে উত্তর দিল :

-আসলে আমার মাথায় একটা চিন্তাই সারাক্ষণ ঘুরপাক খাচ্ছিল তো, তাই অন্য কিছু ভাবার ফুরসতই পাইনি।

-কোন চিন্তা?

-কীভাবে এখান থেকে সংগ্রহ করা তথ্যগুলো দ্রুত জর্দানে পৌছানো যায় সে চিন্তা! কারণ, আমার অপেক্ষায় অনেকেই বসে আছেন। জর্দান সীমান্ত দিয়ে আমরা গোলানে প্রবেশ করব। আচ্ছা, একটা প্রশ্ন করার ছিল আপনাকে!

-করুন।

-আপনি উম্মে মুহাম্মাদের সাথে কেন দেখা করতে চাচ্ছেন?

-তিনি ছাড়া আমার জর্দান যাওয়ার আর কোনো উপযুক্ত ছুতো খুঁজে বের করতে পারছিলাম না যে!

হামযা কথাটা শুনে চুপ হয়ে গেল। মনটা ভীষণ ভার হয়ে গেল। এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে বলে সে কোনোদিন কল্পনাও করেনি। এখন কী করবে?

-আপনি এই বিয়ের পরিণতি সম্পর্কে সচেতন?

লুবনা সামান্যতম দ্বিধা না করেই সাথে সাথে উত্তর দিল,

-জি। আমি জেনেবুঝেই এদিকে পা বাড়িয়েছি।

-আমি জর্দানে পৌছার কিছুদিন পরেই আমাকে গোলানে পাঠানো হবে! সেখান থেকে ফিরে আসার কোনোরকম সম্ভাবনা নেই! এরপরও কি আপনি নিজ সিদ্ধান্তে অটল?

-এ জন্যেই তো আমি উম্মে মুহাম্মাদের সাথে দেখা করতে চেয়েছি! আপনি চলে গেলে, আমি তার কাছ থেকে 'বীরত্বের' সবক নেব! সবরের দীক্ষা নেব! নিজেকেও মহান কাজে উৎসর্গ করব!

-আমি এতদিন ভাবতাম, আমার বোন উম্মে মুহাম্মাদের মতো আর কেউ নেই! তার মতো আর কেউ হতে পারে না! কিন্তু আপনাকে দেখে,

আপনার কথা শুনে, দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে আমার এত দিনের ধারণা ভুল ছিল।

-আপনি বাড়িয়ে বলছেন! আমি অতি সাধারণ একটা মেয়ে।

-আপনি যে কতটা 'সাধারণ' সেটা আপনাকে বোঝাবার সাধ্য আমার নেই! আপনার যদি আপত্তি না থাকে, ফুপুকে আজকেই আয়োজন করতে বলি? আমরা দুজন একসাথেই জর্দান ফিরব?

-জি! বলুন। লেবাননে থাকাটা আমার জন্যে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ! যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে সরে পড়াই আমাদের দুজনের জন্যে নিরাপদ!

-লুবনা! আরেকটা কথা!

-কী?

-আপনার প্রতি আমি অসম্ভব কৃতজ্ঞ!

-কেন?

-আপনি জেনেশুনে আমার জীবনের শেষ কয়টা দিনকে, অন্য রকম এক ভালো লাগায় পূর্ণ করে তুললেন! অথচ আপনি চাইলে রানির মতো করে বাঁচতে পারতেন!

-ইনশা আল্লাহ! জান্নাতেও!

সলিটারি কনফাইনমেন্ট

১

অতি সংকীর্ণ এক কারাপ্রকোষ্ঠ। নির্জন কুঠুরি। ছোট্ট একটা ছিদ্র আছে, যেটা দিয়ে খাবার দেয়া হয়। বাইরের সাথে যোগাযোগ বলতে এটুকুই! তাও শুধু খাবার দেয়ার সময় খোলা হয়, নইলে দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা এই প্রায় অন্ধকার কবরেই শুয়ে-বসে সময় কাটাতে হয়। পনেরো বছর ধরে পৃথিবীর মুক্ত আলো-বাতাস থেকে বঞ্চিত। আত্মীয়-স্বজন তো দূরের কথা, অন্য কোনো মানুষের সাথেও দেখা করার সুযোগ পাননি। বাড়িতে বৃদ্ধা মা সন্তানের প্রতীক্ষা করতে করতে পলে পলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। ১৯৯৩ সাল থেকে বন্দীজীবন কাটাচ্ছেন। শায়খ ইয়াসিন তখন বন্দী। তাকে মুক্ত করার একে একে সব প্রয়াস ব্যর্থ! কিন্তু মানুষের মনে তার প্রতি ভালোবাসার শক্তি ব্যর্থ হতে পারে না। তরুণদের কাছে তিনি ছিলেন স্বপ্নের নায়ক। শায়খকে উদ্ধার করার জন্যে একজন ফিলিস্তিনি যুবক এক দুঃসাহসিক পরিকল্পনা গ্রহণ করল। সাথে নিল আরও তিন সাথীকে। শুরু হলো প্রস্তুতি।

***

এক বৃষ্টিভেজা রাতে, সাবের ও তার সাথীরা একজন ইসরায়েলি সেনাকে বন্দী করতে সক্ষম হলো। নাসিম তলিদানো তার নাম। ইসরায়েলি প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো হলো, শায়খ ইয়াসিনকে মুক্তি দিতে হবে। নইলে 'নাসিম'কে হত্যা করা হবে। ইসরায়েলি সরকার চরমপত্রকে

আমলে না নিয়ে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করে দিল। নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার পর, নাসিমকে হত্যা করে রাস্তায় ফেলে আসা হলো। ইসরায়েল পাগলা কুকুরের মতো খেপে গেল। দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যাকে তাকে ধরে জেলে পুরতে শুরু করল।

***

একে একে সবাই ধরা পড়ল। শুরু হলো অকথ্য নির্যাতন। মিশনের বাকি সদস্যরা চাপের মুখে নতি স্বীকার করল। আদালত তিনবার যাবজ্জীবন ও অতিরিক্ত ৪৯ বছরের কারাদণ্ড দিল। প্রথম দিকে সাবেরকে সবার সাথেই রাখা হয়েছিল। কিন্তু একবার আসকালান কারাগার থেকে সুড়ঙ্গ তৈরি করে পালানোর চেষ্টা করায় সম্পূর্ণরূপে আলাদা করে ফেলা হয়। জুমার নামায, ঈদের নামায কিছুই সবার সাথে জামাতে অংশ নিয়ে পড়তে দেয়া হয় না। তারপরও সে জেলখানায় বসেই প্রহরীদের কড়া দৃষ্টি এড়িয়ে কয়েকটা বই রচনা করতে সক্ষম হয়েছে। সেগুলো আবার কর্তৃপক্ষের চোখ ফাঁকি দিয়ে বাইরেও পাচার করতে সক্ষম হয়েছে। একটা বই ছিল মারাত্মক। কীভাবে গোপনে সামরিক বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করা যায়, তার বিভিন্ন কৌশল বিবৃত হয়েছে বইটাতে। খোদ ইসরায়েলের বিভিন্ন সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর পাঠ্যসূচিতেও বইটা স্থান পেয়েছে।

***

অসম্ভব ক্ষুরধার মেধার অধিকারী সাবেরের গুরুত্ব বুঝতে ইসরায়েল মোটেও ভুল করেনি। এ জন্যে ২০১১ সালে হামাসের হাতে বন্দী আরেক ইসরায়েলি সৈন্য গিলাত শালীতকে ছেড়ে দেয়ার সময় বন্দী-বিনিময় চুক্তি হয়েছিল, হামাসের দেয়া তালিকায় সাবেরদের বাহিনীর সবার নাম ছিল। ইসরায়েল দলের অন্যদের মুক্তি দিলেও, সাবেরকে মুক্তি দিতে কড়াভাবে অস্বীকৃতি জানায়। তাদের ভাষায় 'সাবের' ইসরায়েলের কারাগারে থাকা সবচেয়ে 'বিপজ্জনক' কয়েদী। ইসরায়েল বুঝতে পেরেছিল, সাবের আর দশজন হামাস সদস্যের মতো নয়। তার মেধা বুদ্ধি ও চিন্তা-চেতনা অন্য সাধারণ ফিলিস্তিনিদের মতো নয়। হামাসের অপরাপর নেতারা যেখানে ইরানের আদর্শে বিশ্বাসী, ছোট ছোট দাড়ির মডারেট মুসলিম, সাবের

সেখানে সুন্নতী দাড়ির কড়া ধাঁচের মুসলিম। এ জন্যে সাবের হামাসের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অগোচরে নিজেই নতুন আরেকটা খুদে দল গঠন করেছিল। হামাসের আপসনীতি সাবেরের পছন্দ ছিল না। এমনকি যারা সম্পূর্ণ ইসলামী পদ্ধতিতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়তে চায়, হামাস তাদের টুঁটি চেপে ধরে। অন্য কাউকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয় না। অঙ্কুরেই বিনাশ করে দেয়। এদিক দিয়ে হামাসের সাথে ইসরায়েলের অদৃশ্য একটা সমঝোতাও আছে। হামাসের বর্তমান নেতাদেরও কেউ কেউ চায় না 'সাবের' মুক্তি পাক। বন্দী-বিনিময় তালিকায় সাবেরের নাম দেয়া ছিল অনেকটা 'আইওয়াশ'।

***

ইহুদী কর্তৃপক্ষ এ জন্যে প্রথম থেকেই সাবেরের দিকে বিশেষ নজর দিতে শুরু করে। নির্যাতন দিয়ে শুরু করে। এমনকি মোসাদের সেরা সেরা ইন্টারোগেটরও সাবেরের মুখ খোলার এসাইনমেন্ট নিয়ে আসে। সবার ফলাফলই এক—কেউ সাবেরের মুখ খোলাতে পারেনি। কারা-কর্তৃপক্ষ এবার অন্য পথ ধরার চিন্তা করল। বন্দী হওয়ার সময় সাবেরের বয়স ছিল ২৫। তার জন্ম ১৯৬৮ সালে। ইহুদীরা প্রচলিত পন্থার বাইরে গিয়ে সাবেরকে অন্যভাবে নমনীয় করতে চাইল। সাবেরকে হাত করতে পারলে বর্তমানে নড়বড়ে হয়ে পড়া হামাসকে ভেঙে সম্পূর্ণরূপে গুঁড়িয়ে দেয়া যাবে। আর সাবেরের সামরিক মেধাকেও কাজে লাগানো যাবে।

সাবের যদি একবার ইসরায়েলের কাছে নতি স্বীকার করে, তা হলে গাযা ও পশ্চিম তিরে তার যা জনপ্রিয়তা, কৌশলে মুক্তি দিলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হামাসের প্রধান নেতা হওয়া সময়ের ব্যাপার। হামাসের নেতৃত্বাসনে নিজেদের কাউকে বসাতে পারলে, ইসরায়েলের বিরাট একটা মাথাব্যথা কমে যায়। সামরিক ব্যয়ও কমে যাবে। নিশ্চিন্তে অন্যদিকে মনোযোগ দিতে পারবে। পশ্চিম তির তো আরাফাতের সময় থেকেই অনুগত। তাদের নিয়ে কোনো ঝামেলাও নেই। হামাসের বর্তমান নেতাদের নিয়েও খুব একটা বিপদের আশঙ্কা নেই। আশঙ্কা হলো, সৈনিক পর্যায়ে থাকা সাবেরের মতো অতি উৎসাহী কিছু টগবগে যুবক। এদের থামানোর জন্যে সাবেরের মতো একজনকে দরকার।

***

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় ঘোষিত হওয়ার পর থেকেই ইসরায়েল ভেতরে ভেতরে ঘুঁটি চালতে শুরু করল। প্রথম প্রথম সাবেরের বৃদ্ধা মাকে দিয়ে চেষ্টা করল। বৃদ্ধা এককথায় তাদের প্রস্তাব নাকচ করে দিল। হুমকি-ধমকিতেও কোনো কাজ হলো না। এবার তারা চূড়ান্ত কৌশলে গেল। মোসাদের একজন তরুণী এজেন্টকে সাবেরের দায়িত্ব দিল। মোসাদ হলেও 'আরোমা' ছিল মোসাদের সবচেয়ে এলিট অংশের সদস্য। সাধারণ পরিবারের কেউ এই অংশের সদস্য হওয়ার সুযোগ পায় না। বংশীয় কৌলীন্য, ক্ষুরধার মেধা আর অমানুষিক পরিশ্রমসাধ্য ট্রেনিংয়ে উত্তীর্ণ হতে পারলেই কেবল এখানে স্থান পায়। এদের কাজ হলো পর্দার আড়ালে। ইসরায়েলের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী টিপি লিবনিও এই দলের সদস্য। লিবনি একবার ঘোষণা দিয়েছিল, আরব শাসকরা বেশি বাড়াবাড়ি করলে আমি তাদের সাথে কাটানো বিশেষ সময়গুলোর গোপন ক্লিপ ফাঁস করে দেব। একজন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েও সে ছিল একজন...!

***

আরোমাকে এমন এসাইনমেন্ট দিয়েই পাঠানো হলো সাবেরের নির্জন কুঠুরিতে। আরোমা বোধহয় একটু ভিন্ন ধাঁচের। দায়িত্ব পেয়েই সাথে সাথে ছুটে এল না। প্রথমে সময় নিয়ে কিছুদিন সাবের, ফিলিস্তিন, হামাস ইত্যাদি নিয়ে নিবিড় পড়াশোনায় মগ্ন থাকল। সে কাজটা শুধু সৌন্দর্য দিয়েই সমাধা করতে চায় না, বুদ্ধিবৃত্তিকভাবেও তীক্ষ্মমেধার অধিকারী 'সাবের'কে প্রভাবিত করতে চায়। তার পাঠসূচিতে তাওরাতের পাশাপাশি কুরআনও ঠাঁই পেল। আরবজাতির ইতিহাসেও আদ্যোপান্ত চোখ বুলিয়ে নিল। সেই ইবরাহীম আ. থেকে শুরু করে, হালের ইন্তিফাদা পর্যন্ত। পাঠপর্ব শেষ হওয়ার পর মাঠপর্যায়ের কাজ শুরু করল। আরোমা অবশ্য আগাগোড়াই পড়ুয়া প্রকৃতির। হার্ভার্ডে থাকাকালেই সিআইএর বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কোর্সে অংশ নিয়েছে। আবার বংশসূত্রে রাশান হওয়ার কারণে, রাশান ইন্টেলিজেন্সেও তার প্রবেশে বাধা ছিল না। অল্প বয়েসেই মেধা ও যোগ্যতায় অনেক দূর এগিয়েছে। পড়াশোনা করা মানুষ হওয়ার কারণে অন্যদের থেকে তার চিন্তাপদ্ধতিও একটু ব্যতিক্রম। আরোমা ভার্সিটিতে থাকতেই আরবী ভাষা শিখেছিল। তার ফুপাও একজন ইয়ামেনী আরব ইহুদী। সে সূত্রে ছোটবেলা থেকেই পারিবারিক পরিমণ্ডলে

আরবীর প্রচলন একদম ছিল না, এমনটা বলা যাবে না। এখন সাবেরের মুখোমুখি হওয়ার আগে, ফুফার বাড়িতেও কিছু সময় কাটিয়ে এল। আরবী বলাটা যাতে সড়গড় হয়ে যায়। তাদের পাশের বাসাতেই অবশ্য এক আরব ইহুদী পরিবার থাকে, তারা কেন যেন হিব্রু ভাষায় কথা বলতেই বেশি পছন্দ করে। বাইরের মানুষের কাছে আরবীজ্ঞান প্রকাশ করতে চায় না।

***

আরোমা একদিন বিকেলে নিতান্ত সাধারণ ফিলিস্তিনি মেয়ের পোশাকে, হিজাব পরে সাবেরের মায়ের সাথে দেখা করতে গেল। নিজেকে সাংবাদিক হিশেবে পরিচয় দিল। অসহায় বৃদ্ধা একাকিত্বের জ্বালা মেটাতে পেরেই মহাখুশি। কথা বলার লোকই পাওয়া যায় না। তার ওপর মেয়েটা তার কলিজার টুকরো সাবের সম্পর্কে জানতে চায়। কথা বলার জন্যে এর চেয়ে প্রিয় বিষয় আর কী হতে পারে! বৃদ্ধা না বুঝেই গড়গড় করে ছেলের শৈশব থেকে শুরু করে পঁচিশ বছর পর্যন্ত যা যা ঘটেছে, সবই উদোম করে দিল। অবশ্য এতে বিপজ্জনক কোনো তথ্যও নেই। সাবের যা কিছু করেছে, শুধু মাকে কেন, হামাসেরও কাউকে ঘুণাক্ষরে টেরটি পেতে দেয়নি। প্রথম দিনের বৈঠকে আরোমা কিছুটা আশাহত হলেও, একেবারে নিরাশ হলো না। সাবের সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য তো জানা হলো। বৃদ্ধার নিজের জীবন, শৈশব, কিশোরী বেলা, স্বামী-সংসার নিয়েও একের পর এক প্রশ্ন করে গেল। আরোমা এখন সাবেরের দাদা ও নানার পরিবারের ঠিকুজি-কুলজি স-ব বলে দিতে পারবে। এমনকি বাড়ির বেড়ালটার কয়টা ছানা তাও। ওয়ারড্রোবে সাবেরের প্রিয় টেনিস র‍্যাকেটটার কী রঙ তাও! বাড়ির লনে বাগান-বিলাসটা কে লাগিয়েছে, সেটাও বলতে পারবে। রাত অনেক হয়ে যাওয়াতে, আরেক দিন আসার কথা বলে বিদায় নিল। প্রথম দিন হিশেবে প্রাপ্তি মন্দ নয়।

***

এবার মুখোমুখি হওয়া যায়। সামান্য খুঁত রয়ে গেছে অবশ্য। আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে ইতিহাসটা আরেক বার পড়ে নিলেই হবে। কারণ, সাবেরের সাথে আলোচনার টেবিলে বসলে, নিশ্চিত এই প্রসঙ্গটা আসবেই! ইখওয়ান সম্পর্কে আগেই ভালোভাবে পড়াশোনা থাকায় এবার সেদিকে

যেতে হলো না। এক সকালে ‘ওয়েলিং ওয়াল’ ধরে প্রার্থনা করে কারাগারের উদ্দেশে রওনা দিল। সাথে নিল, শায়খ ইয়াসিনের একটা ফটোগ্রাফ। আর সাবেরের মায়ের হাতের একটা আংটি!

***

আরোমাকে দেখেই সাবেরের ঠোঁটে মুচকি হাসির রেখা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। ব্যাপারটা আরোমার দৃষ্টি এড়াল না। এতদিন ধরে যা ভেবে এসেছিল, যেভাবে কথা শুরু করবে বলে ঠিক করে এসেছিল, হাসিটা দেখে সব ভেস্তে গেল। অনেকটা মুখ ফস্কেই বেরিয়ে গেল :

-হাসলেন কেন?

-কেন হেসেছি সেটা আপনিও জানেন। আপনাকে দেখেই আমার মাথায় একটা নাম বিদ্যুচ্চমকের মতো ঝিলিক দিয়ে উঠেছে। টিপি লিবনি।

আরোমা কিছুটা ম্রিয়মাণ হয়ে গেল। পরক্ষণেই সতেজ হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠল :

-সবাইকে এক পাল্লায় মাপতে যাবেন না।

-আমি মাপতে যাব কেন! আপনি কেন এসেছেন, সেটা যদি আমি খুলে বলি আপনি অস্বীকার করতে পারবেন? আর আমাদের কুরআনের শুরুতেই আপনাদের সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা দেয়া হয়েছে।

-সূরা ফাতেহার ‘অভিশপ্ত’ হওয়ার ব্যাপারটা?

-জি।

-কিন্তু সেটা তো সব ইহুদী সম্পর্কে বলা হয়নি!

-সেটা আপনি বললে তো হবে না!

-আমি বলতে যাব কেন, কুরআনই বলছে সে কথা!

-কুরআন বলছে? কোথায়?

-আলে ইমরানের ৭৫ নম্বর আয়াতে; ইহুদীদের মধ্যে কিছু মানুষ এমনও আছে, আপনি তাদের কাছে কিনতার (অগাধ সম্পদ) আমানত রাখলেও তারা আপনাকে সেটা সময়মতো ফেরত দেবে।

-বেশ প্রস্তুতি নিয়েই এসেছেন দেখছি! আচ্ছা, আপনি কি নিয়মিতই ওয়েস্টার্ন ওয়ালে যান?

-এ কথা কেন জানতে চাচ্ছেন?

-আজ গিয়েছেন দেখে জিজ্ঞেস করলাম।

-আজ গিয়েছি সেটা আপনি মাটির নিচে বসে কীভাবে টের পেলেন?

-যাক, গিয়েছেন সেটা স্বীকার করে নিলেন। কীভাবে টের পেয়েছি? সেটা তো খুবই সহজ! আপনার জুতোর সামনে চুইংগামের আঠা লেগে আছে দেখে।

-চুইংগামের সাথে আমাদের হলি ওয়েলিং ওয়ালের কী সম্পর্ক?

-আছে। আপনি খেয়াল করলে দেখবেন, আপনারা যখন দেয়ালের সাথে লেপ্টে গিয়ে প্রার্থনা করেন, তখন কারও কারও মুখে চুইংগাম থাকে। প্রার্থনা শুরু করার আগে চুইংগামটা সাধারণত মুখ বরাবর নিচেই ফেলে! বেশি কষ্ট করতে যায় না। পরের জন আসলে, তার জুতোর সাথে চুইংগামটা লেগে যায়। তা ছাড়া আপনার জামার পোশাক থেকেও হালকা একটা সুবাস বের হচ্ছে, যা শুধু ওয়েলিং ওয়ালেই থাকে।

-আপনি এতকিছু কীভাবে জানলেন? ওটা তো অত্যন্ত সংরক্ষিত এলাকা! অ-ইহুদি কেউ সেখানে যাবার কল্পনাও করতে পারে না।

-চেষ্টা করলে সেখানে যাওয়া কি খুবই অসম্ভব! এই যে আপনি হামাসের নাকের ডগা দিয়ে আমার মায়ের কাছে গেলেন, সেটাও কি আপাতদৃষ্টিতে একজন ইহুদী-কন্যার জন্যে অসম্ভব ও অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ ছিল না?

-আমি আপনার মায়ের কাছে গিয়েছি, সেটা কীভাবে টের পেলেন?

-টের পাইনি, অনুমান করেছি।

-কী দেখে অনুমান করলেন?

-আপনি কথায় কথায় 'খার' শব্দটা ব্যবহার করছেন। এটা আমার মায়ের বিশেষ শব্দ! 'খায়র' শব্দটাকেই তিনি এভাবে উচ্চারণ করেন। অবচেতনভাবে আমাকে মায়ের কথা মনে করিয়ে দিলেন, প্রভাবিত করার জন্যে!

-আমি আপনার জন্যে দুটো উপহার এনেছি।

-কী?

-একটা হলো আপনার মায়ের আংটি, আরেকটা আপনার নেতার ছবি।

-শায়খ ইয়াসিনের?

-জি!

-কাগজের ছবি দিয়ে কী হবে? হৃদয়েই তার ছবি আঁকা আছে! তবে যদি আংটিটা দিয়ে যান তা হলে ভালো লাগবে। আজ আর আমার কথা বলতে ইচ্ছে করছে না! আপনি কিছু মনে না করেন, আপনাকে দিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে একটা আবেদন করতে চাই।

-বলুন!

-রাতে যখন আপনি আমাদের আজকের কথোপকথনের ভিডিও নিয়ে আলোচনায় বসবেন তাদের বলবেন, সামনে থেকে যেন কোনো মেয়ে না পাঠায়।

-আমাদের আলোচনা ভিডিও হচ্ছে কীভাবে বুঝলেন?

-এটা একটা প্রশ্ন হলো?

-আচ্ছা, মেয়ে হলে আপত্তি কোথায়?

-এর উত্তর আপনার নিজের কাছেই আছে!

***

আরোমা এর আগে অনেক বন্দীকে জেরা করায় অংশ নিয়েছে। বন্দীরা তার জেরার মুখে রীতিমতো ঘেমে উঠেছে। আজ দেখি সম্পূর্ণ উল্টো! আশ্চর্য! কোনো কিছুই মানুষটার দৃষ্টি এড়ায় না। সবকিছুই যেন তার নখদর্পণে! লোকটা আমাদের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা-বেষ্টনী ভেদ করে, 'ওয়ালের' কাছে কীভাবে গেল? হাইকমান্ডকে বলে এক্ষুনি সেখানকার নিরাপত্তার ফাঁকগুলো বের করতে হবে। নইলে কী যে হতে পারে, ভাবতেও গা শিউরে উঠছে। লোকটা যদি মেয়ে অফিসারের সাথে কথা না বলার দাবি নিয়ে গোঁ ধরে থাকে, তা হলে ব্যাপারটা পুরোই কেঁচে যাবে! জীবনের প্রথম 'ইনডিভিজুয়াল এসাইনমেন্ট'! এত প্রস্তুতি, এত দীর্ঘ পরিশ্রম বৃথা যাবে? না, এটা কিছুতেই হতে দেয়া যাবে না! আমাকে আবার গোড়া থেকেই শুরু করতে হবে! রাতে অফিসারের সাথে বসে, আমাদের আজকের আলোচনায় উভয় পক্ষের দুর্বল জায়গাগুলো খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে। বসের সাথে বসার আগেই একটা ট্রায়াল হয়ে যাক না! উভয়ের ভুলগুলো কী কী?

এক. আমার প্রথম ভুলই ছিলো প্রার্থনা করে, সে পোশাকে দেখা করতে যাওয়া।

দুই. ওর কথায় প্রভাবিত হয়ে প্রশ্ন করা ছিল আজকের সবচেয়ে বড় ভুল! আমি ওয়ালের কাছে প্রার্থনা করেছি কি করিনি, সেটা নিয়ে সাবেরের মন্তব্য করার পর সেটা ভ্রুক্ষেপ না করাই ছিল যুক্তিযুক্ত।

অবশ্য তারও দুর্বল পয়েন্ট আছে, সে মায়ের প্রতি বেশ দুর্বল। আবার প্রথমেই আলোচনাটা আমার নিয়ন্ত্রণেই এসে গিয়েছিল প্রায়। আমি ধরে রাখতে পারিনি! আমি যখন কুরআন থেকেই প্রমাণ দিলাম, ইহুদীদের মধ্যেও ভালো আছে, তখন সাবের পাল্টা যুক্তি দেয়নি। ইশ! আমিই মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের লাগাম তার হাতে তুলে দিয়েছি। বস এ জন্যে বকুনি না দিলেই হয়! আমাকে আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। সাবেরের 'উইক পয়েন্ট' বের করতে হবে! এত সহজে হাল ছাড়ার পাত্রী আমি নই। একটা ব্যাপার বেশ অবাক লেগেছে। পৃথিবীর সব 'মুসলিম টেররিস্ট'-এর চোখই এমন? ওসামা আর সাবের উভয়ের চোখের গড়নে দারুণ মিল! দাড়িও! বিষয়টা নিয়েও গভীরভাবে ভাবতে হবে। তবে সাবধান থাকতে হবে। লোকটার চোখের চাহনি অসম্ভব ক্ষুরধার! যেন কেটে ফেলবে!

-২-

সাবেরকে ফিলিস্তিনে খুব বেশি উচ্চবাচ্য হতে দেখা যায় না। পত্র-পত্রিকাতেও তার খবর খুব একটা পাওয়া যায় না। ইসরায়েল ও হামাস-ফাতাহ উভয় পক্ষই বোধহয় তাকে ভয় পায়। কিন্তু ইসরায়েল সরকার সাবেরকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে। তারা সাবেরের ভালো চায়! মুক্তি চায়! কিন্তু তাকে কিছু শর্ত মানতে হবে! কিছু প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে! ইসরায়েল এসব কথা কখনো সরাসরি বলেনি। ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে বলেছে। ইশারা-ইঙ্গিতে, ইনিয়ে-বিনিয়ে বলার চেষ্টা করেছে। সাবের ভাবতে বসল। নির্জন কুঠুরিতে পাঠিয়ে দেয়ার পর, তার ধারণা হয়েছিল, এবার বোধহয় তাকে ফুসলানো বন্ধ করবে। কিন্তু আজকের ঘটনা তার ধারণা ভুল প্রমাণিত করেছে! তার হিশেবে সাধারণত ভুলের পরিমাণ কম হয়। হিশেব মেলানোর সময় তথ্য-বিভ্রাট থাকলে ভুল তো হবেই! কারা-কর্তৃপক্ষ তাকে সব ধরনের তথ্য থেকে বঞ্চিত করেছে। ইদানীং তাই ভুলও

হচ্ছে বার বার! দিনে মাত্র এক ঘণ্টার জন্যে তাকে সূর্যের আলোতে নিয়ে আসা হয়, বাকিটা মাটির কবরে। এভাবে একজন মানুষের শরীর তো বটেই, মনও ভেঙে যাওয়া স্বাভাবিক।

সাবের নানা অবস্থান থেকে নিজেকে যাচাই করার চেষ্টা করল, নতুন এই বিপদটা কীভাবে সামাল দেবে! পুরুষ হলে, ব্যাটাকে নাগালে পেতেই টুঁটি চেপে ধরতে দ্বিধা হতো না। ফলাফল যা হওয়ার হতো। কিন্তু এই মেয়ে তো শত্রুর রূপ ধরে আসে না, বন্ধু হয়ে আসে! সুঁই হয়ে এসে, কুড়োল হয়ে বের হবে! আমার কর্মকৌশল হবে আপাতত এই 'মায়াজাল'কে প্রতিরোধ করা। তার সাথে যাবতীয় কথাবার্তা-সহযোগিতা বন্ধ করা। কিন্তু ভয়ের কথা হলো, এরা এ ধরনের পরিস্থিতির মোকাবেলায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত! কোন দিক থেকে যে বিষাক্ত ছোবল হেনে বসবে বলা মুশকিল! আল্লাহর কাছে আশ্রয় নেয়া ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প আপাতত নেই।

***

আরোমা আবার সাবেরের মায়ের কাছে গেল। আজ বুড়ির পছন্দমতো একটা খাবারও কিনে নিয়ে গেল।

-আপনার জন্যে একটা উপহার নিয়ে এসেছি। আপনি সেদিন বলেছিলেন, সাবের আপনার জন্যে মসজিদে ওমরের পাশ থেকে নিয়মিত 'লাহিম' (হালিমজাতীয় খাবার) এনে দিত! অনেক দিন ধরে তো 'লাহিম' খেতে পাচ্ছেন না। এই নিন!

-মা, তুমিই আমার জন্যে জীবন্ত লাহিম! তুমি চলে যাওয়ার পর কত আফসোস করেছি! কেন যে তোমার ঠিকানাটা রেখে দিলাম না! যদিও বুঝতে পেরেছি, তুমি মুসলিম নও। ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্য নিয়েই আমার কাছে এসেছ। তবুও মা! তোমাকে আমার ভালো লেগেছে। তোমাকে আমার শত্রুপক্ষ মনে হয়নি। তোমার কাছে সেদিনও পিস্তল ছিল, আজও আছে। তুমি চাইলে আমাকে মেরেও ফেলে রেখে যেতে পার। আমার কিছুই করার থাকবে না। ছেলের শোকে অন্ধ হতে চলা একজন বৃদ্ধার কীইবা করার আছে বলো।

-(ছেলের মতো মাও দেখছি কম যান না। অথবা বলতে পারি, মা এমন চৌকস হওয়ার কারণেই ছেলে এমন ধারালো হয়েছে।) আমি প্রথমেই দুঃখ প্রকাশ করছি! অম্লানবদনে স্বীকার করে নিচ্ছি, আমি মুসলিম নই। একটা মিশন নিয়েই আপনার কাছে এসেছি। তাই বলে আপনার কোনো ক্ষতি করতে আসিনি।

-তুমি বুঝি মোসাদের লোক।

-অনেকটা তাই। এই নিন, একটা রুমাল!

-আরে, এটা তো আমার 'সাবেরে'র রুমাল! কোথায় পেলে মা? আজ কত বছর পর, তার গায়ের সুবাস পেলাম! তুমি তাকে দেখেছ? কবে দেখেছ? সে কেমন আছে? তাকে ঠিকমতো খেতে দেয়? তাকে নাকি খুবই পেটানো হয়?

-পেটানো হয় কে বলেছে?

-যারা ইসরায়েলি কারাগারে বন্দী হয়, তাদের পেটানোর জন্যেই তো আটক করা হয়। যেখানে আমরা যারা মুক্ত আছি, তাদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালানো হয়, সেখানে বন্দীদের অবস্থা কেমন, সহজেই অনুমেয়!

-আপনার কাছে একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। বলতে পারেন, আমি বাধ্য হয়েই এটা করছি। আমি হুকুমের দাসী।

-বলো।

-আপনি ছেলের কাছে একটা 'মেসেজ' পাঠাবেন সে যেন আমাকে এবং কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করে।

-তুমি কি প্রস্তাবের আড়ালে আমাকে হুমকি দিচ্ছ?

-আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনার ক্ষতি করার ইচ্ছে থাকলে, হুমকি দেয়ার ভণিতা করতে হবে কেন?

-তাও ঠিক! তবে একটা কথা আমি পরিষ্কার করে বলে দিতে চাই, তোমার আগে আরও অনেকে এসে আমাকে দিয়ে সাবেরকে নতি স্বীকার করাতে চেয়েছে। আমি তাদের সাথে কথাও বলতে চাইনি! আমার একটা চোখ নষ্ট হওয়ার কারণও তা-ই! সাবেরের আব্বুও আপস না করার কারণে শহীদ হয়েছেন। আমার আরও তিন ছেলে বন্দী হয়েছে। আমি কিছুতেই সাবেরকে কোনো অন্যায় অনুরোধ করতে পারব না!

আরোমা আরও কিছুক্ষণ থেকে, টুকটাক কথা বলে ফিরে এল। পরিস্থিতি আস্তে আস্তে নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। তবে হাল ছাড়া যাবে না। একটা বিষয় ভালো লাগল, সে ব্যক্তি হিশেবে, সাবেরের মায়ের কাছে সমাদৃত হয়েছে। তাকে আদর করে খাইয়েছেন। আপ্যায়ন করেছেন। আবার আসার জন্যে আন্তরিকভাবে দাওয়াতও দিয়েছেন। সে শত্রুপক্ষ জেনেও। এবার মূল জায়গায় কীভাবে নিজেকে 'নির্ভরযোগ্য' করে তোলা যায়, সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে।

***

-আপনি আমার প্রশ্নর উত্তর দেবেন না বলেই ঠিক করেছেন?

-আপনাদের কিছু জানার থাকলে, কোনো পুরুষ সদস্যকে পাঠানো হোক।

-বিষয়টা আমি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে জানিয়েছি। আপনি আমাকে সহযোগিতা না করলে, তারা ভিন্ন পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হবে।

-ওটাই তো আপনাদের মূল পুঁজি। জোর করে সবকিছু আদায় করা।

-(আহ স্বস্তি! যাক, বিতর্কে আসছে।) আমরা নিজেদের অধিকার বুঝে নেব না?

-স্বামী-সন্তানহারা একটা অসহায় মহিলার ওপর নির্যাতন করে, অধিকার আদায়? এই অন্ধ হতে চলা অসহায় মানুষটা আপনাদের কী অধিকার কেড়ে নিয়েছিল?

-উনি কেড়ে না নিলেও, তার ছেলে কেড়ে নিয়েছে। আমাদের অত্যন্ত উঁচু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন সৈনিককে হত্যা করেছে।

-আপনারা 'বেলফোর' ঘোষণার আরও আগে থেকে, আমাদের কত কত টগবগে তরুণকে হত্যা করেছেন?

-(উঁহু! ঝগড়া নয়!) আচ্ছা, এটা তো মানবেন, আমরা যেমন হত্যা করেছি আপনারাও সেই শুরু থেকেই আমাদের হত্যা করে আসছেন?

-শুরু থেকে মানে?

-(এহহে! আবার ঝগড়ার দিকেই যাচ্ছে।) আমি বলতে চেয়েছি, বনু কুরাইযা-খায়বার থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত।

-দেখুন! ইতিহাস না জেনে অন্ধের মতো কথা বলবেন না।

-আপনি কোন ইতিহাসের কথা বলছেন?

-ইসলামের ইতিহাস।

-হাসালেন। আপনি নিশ্চয় মুসলিম-লেখকদের লিখিত ইতিহাসের কথা বলছেন? সেটা আমরা বিশ্বাস করতে যাব কেন? আপনিও কি একজন ইহুদী লেখকের ইতিহাস-বই বিশ্বাস করবেন? উভয় জাতির মাঝেই একটা দূরত্ব সেই শুরু থেকেই তৈরি হয়েছে।

-আপনি কথার মারপ্যাঁচ দিয়ে, সত্যকে ধামাচাপা দিতে পারবেন না। আর তর্ক করে এসব বিষয় খোলাসা করা যাবে না। আপনার কাছে আপনারটা সত্য বলে মনে হবে; আমার কাছে আমারটা। তবে সত্যানুসন্ধানী মানসিকতা থাকলে, ঠিকই বুঝতে পারবেন কারা জালেম আর কারা মাজলুম।

-আচ্ছা, একটা অনুরোধ—আমরা আপনার সহযোগিতা চাচ্ছি।

-অনুরোধ না বলে বলুন হুকুম। আমি একজন বন্দী মানুষ। আমাকে দিয়ে কোনো কাজ হবে বলে মনে হয় না!

-আমরা চাই, আপনি হামাসের তৈরি করা টানেলগুলো সম্পর্কে বলুন। কার কাছে গেলে আমরা সেগুলোর মাস্টারপ্ল্যানটা পাব?

-আমি ছিলাম হামাসের মাঠপর্যায়ের কর্মী। এসব গোপন তথ্য তো আমার জানা থাকার কথা নয়।

-কিন্তু এটা তো জানেন, টানেল তৈরির ব্যাপারটা কে দেখাশোনা করেন?

-আপনি বুঝি কৌশলে জেরা শুরু করে দিয়েছেন?

-জেরা নয়, আমি আসলে আপনার মাকে বাঁচাতে চাইছি। আমি যদি আজ কোনো তথ্য না নিয়ে যেতে পারি তা হলে আপনার মা কষ্ট পাবেন। আপনার অন্য ভাইদের ওপর নির্যাতন চালানো হবে।

-শুধু আমার মা-ভাই কেন, আপনি গোটা ফিলিস্তিনকে পুড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিলেও আমি কিছু বলতে পারব না।

-আমি সত্যি সত্যি আপনার মাকে পছন্দ করি। তাকে আমার ভালো লেগেছে। তিনিও আমাকে খুবই পছন্দ করেছেন।

-আপনি তো ছলাকলা করে মানুষকে মুগ্ধ করার প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

-দেখুন, আপনি বুদ্ধিমান মানুষ। আপনার মাও সব জেনেছেন! আমি কে, কী করি, এটাও তিনি নিজে থেকেই আঁচ করে ফেলেছেন! আমার কৌশল কোনো কাজে আসেনি।

-আপনি আমার মাকে 'ইমোশনালি ব্ল্যাকমেইল' করেছেন। আমাকে সাহায্য করার মুলো ঝুলিয়েছেন। নইলে আমার মা, আপনাকে ঘরেও ঢুকতে দিতেন না। আপনি যখন আমার রুমালটা উঠিয়ে নিচ্ছিলেন, তখনই বুঝতে পেরেছিলাম, আমার সাথে সাথে আমার মাও আপনাদের হিংস্র থাবা থেকে মুক্ত থাকতে পারছেন না। একজন দুর্বল বৃদ্ধাকে এভাবে নির্যাতন-হয়রানি করে কী লাভ?

-তা হলে আপনি অন্তত কিছু তথ্য দিন। আমরা প্রাথমিকভাবে আপনার একটা আবেদন গ্রহণ করব।

-কোন আবেদন?

-আপনি জেলে থেকেই 'পলিটিক্যাল সায়েন্স' নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চেয়েছিলেন। অন্যদের মতো আপনাকেও আমরা সুযোগ করে দেব।

-আমাকে একটা কাগজের টুকরো আর কলম দিন।

-(মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল) এই নিন!

-আমি একটা তথ্য দিতে পারি। সেটা অফ দ্যা রেকর্ড থাকতে হবে। অবশ্য একটা কাজ করতে হবে। নইলে তথ্যটা কাজে লাগবে না।

-কী কাজ?

-একটু অভিনয় করতে হবে।

-কার অভিনয়!

-একজনের স্ত্রীর ভূমিকায়। অথবা আমার মায়ের ভূমিকায়। আপনি আমার মায়ের ভূমিকার জন্যে ফিট নন। কারণ, যার কাছে আপনাকে পাঠাব, তিনি একে তো অন্ধ; তার ওপর আপনাকে যেতে হবে অন্ধকারে। তিনি আপনাকে ছুঁয়েই বুঝে যাবেন, আপনি বৃদ্ধা নন। তার সাথে আমার এমনই কথা ছিল।

-আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি।

***

-আপনার কথামতো গন্তব্যে গিয়েছিলাম। সামান্য কিছু অস্ত্র ছাড়া আর কিছু তো মিলল না।

-বেশি কিছু মিলবে এমন আশ্বাস কি আমি দিয়েছি? আপনি আমাকে পড়ার সুযোগ করে দেবেন বলেছেন, এর বিনিময়ে আপনি তথ্য চেয়েছেন। আমি দিয়েছি।

-আপনি পুঁচকে কয়েকটা অকেজো অস্ত্রের সন্ধান দিয়েছেন। এসব দিয়ে কর্তৃপক্ষের মন ভিজবে না। তারা আমার কাছ থেকে আরও বড় কিছু আশা করে।

-বড় কিছু বলতে?

-তারা চায় আপনি ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল উভয় পক্ষেরই স্বার্থ রক্ষা করুন। আর হ্যাঁ, আমি আজ সাউন্ড-সিস্টেম অকেজো করে দিয়ে এসেছি! ভিডিও হচ্ছে, তবে সাউন্ড রেকর্ড হচ্ছে না। আজ কন্ট্রোল-রুমে এই মুহূর্তে বড় কেউ নেই। সন্দেহজনক আচরণ করা ছাড়া, আমরা যেকোনো বিষয়ে কথা বলতে পারি।

-আগেই বলেছিলাম, একজন নারীর সাথে আমি 'জেরায়' বসব না। আপনি আমাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন।

-আমার পুরো কথা না শুনেই রেগে গিয়েছেন! পুরো কথাটা শুনুন! আপনি আমাকে যে বৃদ্ধা মহিলার সাথে দেখা করতে বলেছেন, তিনি কে?

-আমার খালা। তিনি খালা হওয়া ছাড়া আরও কিছু হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল।

-কিন্তু তার তো কোনো মেয়ে আছে বলে শুনিনি।

-এখন নেই, তবে ছিল। আপনারা তাকে বাঁচতে দেননি। সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের আগের রাতেই ইসরায়েলি সৈন্যরা হানা দেয়।

-আপনার খালা আমাকে সত্যি সত্যি আপনার স্ত্রী ধরে নিয়েছেন। আমি কোডটা বলার পর, আর কিছু জানতে চাননি! একটা আংটিও দিয়েছেন।

-আপনার ধারণা ভুল! তিনি বৃদ্ধা হয়ে গেলেও, এতটুকু জ্ঞান অবশ্যই রাখেন একজন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী কারাগারে বসে বিয়ে করতে পারে না।

-তা হলে আংটি কেন দিলেন?

-সেটা আমি বলব না। ওটা ছিল তার মেয়ের আংটি।

-আচ্ছা, ওটা কি সেন্সরড? ইশ্ আমাকে আপনি কী বোকাটাই না বানালেন! ভাগ্যিস সাউন্ড অফ! নইলে ডিপার্টমেন্টে সবার সামনে আমার মুখে চুনকালি মেখে যেত। আর হ্যাঁ, আমি আপনার খালার কথা ডিপার্টমেন্টে বলিনি।

-যাক, আমি শেষ বারের মতো বলছি। আপনি আর আসবেন না...।

***

-আপনার জ্ঞাতার্থে বলছি! ভালোর জন্যেই, আপনাকে আমার সাথেই কাজ করতে হবে! এর কোনো ব্যতিক্রম হবে না। শুধু শুধু কেন নিজের ওপর বিপদ ডেকে আনবেন? এটা হুমকি নয়, কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলাম। অতীতে কথামতো না চলার কারণে কেমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন, তা নিশ্চয় আমাকে বলে দিতে হবে না। আমি আপনার ভালো চাই। আমি চাই আপনি এই লৌহ-পিঞ্জিরা থেকে বের হয়ে, মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিন।

-আপনাদের যাবতীয় শর্ত মেনে মুক্ত হওয়ার চেয়ে এই লৌহ-গরাদই আমার বেশি প্রিয়।

-আমি আপনার 'গল্পের' বইটা পড়ে শেষ করেছি।

-কোনটা? 'ওয়াফা'?

-জি! সেখানে অবশ্য আপনাকে এতটা রুক্ষ মনে হয়নি। আর 'হিকায়াতু সাবের' বইটা ইদানীং আর ছাপা হচ্ছে না। আমি একজনকে দিয়ে গাযা থেকে আনিয়ে পড়েছি। সেখানে আপনাকে একটু জেদি দেখালেও, এখনকার মতো এত 'ইয়ে' মনে হয়নি।

-মনে রাখতে হবে, 'হিকায়াতু সাবের' বইটা আমি জেলে বসেই লিখেছি।

-আমরা খুবই অবাক হয়েছি, আপনি কীভাবে তিনটা পাণ্ডুলিপি বাইরে পাচার করলেন। না জানি, আরও কী কী তথ্য অগোচরে পাচার করে দিয়েছেন। আরেকটা কথা, আপনি যদি আমাকে সহযোগিতা না করেন আমার বদলে আরেক মহিলা এজেন্টকে পাঠানো হবে। সেটা আপনার জন্যে মোটেও সহনীয় বা আরামদায়ক কিছু হবে না।

-আমাকে এসবের ভয় দেখাবেন না। অতীতে আমার প্রতি যা হয়েছে, তার চেয়ে কঠিন আর কিছু হতে পারে না।

-আচ্ছা এমন কি হতে পারে না, আপনি মিছেমিছি সমঝোতা করে বের হলেন। পরে...।

-পরে কী?

-আমি আপনার জন্যে সুবিধাজনক কোনো 'এস্কেপ রুট' বের করে দিলাম।

-আবারও টোপ দিচ্ছেন?

-আপনার ভালোর জন্যেই বলছি! আমার কথা মেনে না নিলে পরে কিন্তু পস্তাতে হবে। আমার কোনো দোষ নেই। আমি হুকুমের দাসীমাত্র।

***

আরোমাকে সরিয়ে সাময়িকভাবে আরেকজনকে দায়িত্ব দেয়া হলো। নতুন এজেন্ট এসে শুরুতেই কঠিন অবস্থান নিল। সাবের একজন মহিলার সাথে কথা বলতে কঠিনভাবে অস্বীকৃতি জানালেন। শুরু হলো ত্রিমুখী নির্যাতন। সাবেরের পাশাপাশি বৃদ্ধা মা ও তিন ভাইকেও ছাড়া হলো না। কিন্তু সাবেরের এক কথা।

-একটা পরিবার কিছুতেই একটা জাতির চেয়ে, কুদসের চেয়ে বড় হতে পারে না। মেরে ফেললেও, আমি মুখ খুলব না।

অকথ্য নির্যাতনে, সাবের মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ল। তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে ইসরায়েলের স্বার্থেই! একটু সুস্থ হওয়ার পর, আরোমা আবার এল।

-আপনাকে না বাদ দিয়ে দেয়া হয়েছে?

-হয়েছিল। আবার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

-কেন? আপনি ছলাকলা খাটিয়ে চেষ্টা করেছেন, পরেরজন বল খাটিয়ে চেষ্টা করে গেছে, কাজ হয়নি। আবার কেন এসেছেন?

-শুনুন! আমি আজও সাউন্ড বন্ধ করে এসেছি। আজকের পর আর সুযোগ পাব না। আগের দিন যান্ত্রিক ত্রুটি বলে চালিয়ে দিয়েছি। আমি আপনার মাকে দেখতে গিয়েছিলাম! আমি ব্যক্তিগতভাবে দুঃখিত! কিন্তু আপনি

আমাদের দাবি মেনে নিলে একজন অসহায় বৃদ্ধাকে এভাবে নির্যাতন সইতে হতো না।

-আপনার সুর আজ একটু ভিন্ন রকম শোনাচ্ছে? আমি জানি, আপনাকে আসলে সরিয়ে দেয়া হয়নি, আপনার অবর্তমানে যাকে পাঠানো হয়েছিল, তার কাজ ছিল আমার সাথে কঠোর ব্যবহার করে আমাকে আপনার প্রতি আগ্রহী করে তোলা। যাতে আমি ভাবতে বাধ্য হই আগেরজনই তো ভালো ছিল। এমন একটা আবহ তৈরি করে, আপনাকে আবার পাঠানো হয়েছে।

-আপনি বুদ্ধিমান মানুষ! কিন্তু আপনাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আপনার চিকিৎসায় কোনো ত্রুটি করা হয়নি।

-সেটাও নিজেদের স্বার্থেই করেছে।

-কেমন স্বার্থ?

-ইসরায়েল আমাকে মেরে ফেলতে চাইলে, সেই কবেই মেরে ফেলত। এতদিন যেহেতু বাঁচিয়ে রেখেছে, নিশ্চয় আমাকে নিয়ে তারা কোনো ফন্দি আঁটছে! আমি বেঁচে থাকলে তারা দেখাতে পারবে, দেখো! আমরা অহেতুক মানুষ মারি না। আমাদেরও আইন-আদালত আছে। এ ছাড়া আমাকে দেখিয়ে অন্যদের ভয় দেখানো সহজ। অন্যদের আমার শাস্তির কথা বলে, নরম করার প্রয়াস পাবে।

-আচ্ছা, আমি যদি বলি, আপনার আম্মু সত্যি সত্যি আমাকে পছন্দ করেছেন সেটা কি আপনার বিশ্বাস হবে?

-অবিশ্বাস করার কী আছে? আপনি পিস্তল সাথে করে নিয়ে গেলে, যেকোনো মহিলাই আপনাকে পছন্দ করেছে বলবে।

-আপনার আম্মু বলেছেন, আমি নাকি 'ইহুদী' নই। তার নাকি সন্দেহ হচ্ছে। আমি গত দেড় সপ্তাহে, আপনাদের সম্পর্কে আরও অনেক কিছু পড়েছি। আমাদের সম্পর্কেও পড়েছি।

-অনেকই তো পড়লেন। কই সেগুলো কোনো কাজে দিয়েছে?

-দেয়নি যে তা কী করে বুঝলেন? আপনাকে একটা অনুরোধ করতে পারি?

-করুন।

-আপনি আমাকে এমন একটা তথ্য দিন, যার বিনিময়ে আমি অফিসারদের কিছুদিনের জন্যে হলেও, ভুলিয়ে রাখতে পারব?

-ভুলিয়ে রাখলে আমার লাভ?
-আমি আরেকটু ভাবার সুযোগ পাব। পাশাপাশি আমার গ্রহণযোগ্যতাও বাড়বে! এবার শিগগিরই কোনো কাজ দেখাতে না পারলে, সত্যি সত্যি আমাকে সরিয়ে দু-সদস্যবিশিষ্ট টিম পাঠানো হবে। আপনার কাছ থেকে জোর করে কথা আদায় করার জন্যে। তার মধ্যে একজন মোসাদের কুখ্যাত মহিলা এজেন্ট।
-মোসাদের বুঝি 'সুখ্যাত এজেন্টও' আছে? আর কীভাবে কথা আদায় করবে?
-আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না, তুরিয়া কতটা ভয়ংকর!
-তার নাম তুরিয়া?
-জি! সে আপনার মনোবল, ধার্মিকতা, চরিত্রশক্তি ভেঙে দেয়ার জন্যে যা যা করা দরকার, সবই করবে! আপনার বাধা দেয়ার কোনো ক্ষমতাই থাকবে না।
-আপনি এসব বলে আমাকে ভয় পাইয়ে দেয়ার চেষ্টা করছেন বুঝি? আপনার গুরুত্ব বোঝানোর জন্যে?
-আমার এ কথাটা অন্তত বিশ্বাস করুন।
-আপনার কথার ধরন আগের তুলনায় একটু বদলে গেছে কেন?
-আসলে আমি চাইনি, আপনার মা ও ভাইয়ের ওপর নির্যাতন চালানো হোক। আপনার পিতাও তো এভাবেই মারা গেছেন! এখন আপনার পরিবারের বাকিরাও এভাবে মারা যাক, এটা আমি চাই না। আর হ্যাঁ, আমি গত কয়েক দিনে, বেশ কিছু ফিলিস্তিনি বন্দীর সাথে কথা বলেছি।
-কেন?
-আপনাকে বোঝার জন্যে, আপনাদের 'সেন্টিমেন্ট'টা বোঝার জন্যে। এ জন্যে এমনকি কুদসের একজন বরখাস্তকৃত ইমামের সাথেও কথা বলেছি।
-কী বিষয়ে কথা বলেছেন?
-অ-নে-ক বিষয়ে। আপনার আম্মাই তার কাছে যেতে বলেছেন।
-বেশ অবাক করা ব্যাপার তো! একটু খুলে বলুন।
-আপনার বৃদ্ধা মাকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে, আমার চিন্তাটা কেমন যেন হয়ে গেছে!- যখন আপনাদের বাসায় গেলাম, তখনো আপনার মায়ের কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ইসরায়েলি সৈন্যরা চিকিৎসককে আসতে দিচ্ছিল না। আমি একটু দূরে গিয়েছিলাম। ফুপুর বাসায়। অফিসে

এসেই শুনি মূল ঘটনা। সাথে সাথেই দৌড়ে গেলাম! তিনি গেটের কাছেই পড়ে ছিলেন। সৈন্যরা কাছেপিঠে ছিল না। তারা ছিল গলির মুখে। ভয়ে প্রতিবেশীরাও এগিয়ে আসতে পারছিল না। আমি একা একা যতটুকু সম্ভব করলাম। পরিচিত একজন অফিসারকে ফোন করে সৈন্যদের সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করলাম। তারপর ডাক্তারের ব্যবস্থা হলো।

-তারপর?

-রাতটা সেখানেই কাটিয়ে দিয়েছি! অফিসে জানিয়েছি, আমার 'এসাইনমেন্টের' অংশ হিশেবেই এখানে রাত কাটাচ্ছি। তিনি বেহুঁশ ছিলেন। শেষ রাতের দিকে তার জ্ঞান ফিরে এল। চোখ মেলেই আমাকে দেখলেন। ঘরে আর কেউ ছিল না। আশেপাশের অনেকেই সন্ধ্যারাতে ছিল। যথাসাধ্য সাহায্য করেছে। পরে আমি জোর করে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি। পাছে সেনারা যদি আবার হানা দেয়। তিনি কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কী বুঝলেন বলতে পারব না! আচানক আমাকে জড়িয়ে ধরে সে কী কান্না! আর থামতেই চায় না! মনটা আমার ভীষণ আর্দ্র হয়ে উঠল! আবার লজ্জা লজ্জাও লাগছিল! নিজেদের সেনাদের এমন অন্যায় দেখে। বিশ্বাস করুন! সেদিন জীবনে প্রথম বারের মতো আমার কাছে মনে হলো—আমরা জুলুম করছি।

-শুনুন! আপনার কথাগুলো আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে। অবশ্য না করেও উপায় নেই। আমার মায়ের কথা বলুন। আর কী কী হলো?

-একসময় কান্না থামিয়ে বললেন, আমার মেয়ে নেই! ভেবেছিলাম, বোনের মেয়েটাকেই নিয়ে আসব। সবকিছু ঠিকঠাকও ছিল। কিন্তু ওই যে নিয়তি! তাকে কীভাবে খণ্ডাব! তুমি মা! আমার মধ্যে সেই পুরোনো পিপাসা জাগিয়ে দিলে।

জানতে চাইলাম, কিসের পিপাসা? বললেন :

-একটা মেয়ের পিপাসা। মেয়ে থাকলে আজ তোমার মতো করেই তো আমার সেবাযত্ন করত। তুমি হয়তো নিজের কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যেই আমার পেছনে এত কষ্ট করছ। তারপরও তোমার ভালোর জন্য আমি আল্লাহর কাছে দুআ করব! তিনি যেন তোমাকে উত্তম থেকে উত্তম বিনিময় দান করেন।

***

-আমার হাতে আর বেশি সময় নেই। বসের আলোচনায় যা বুঝলাম, আপনাকে নিয়ে আপাতত মাথা ঘামাবে না। আমি রিপোর্ট দিলে সেটা ভালোভাবে যাচাই করে, পরে অন্য কাউকে দিয়ে আবার চেষ্টা চালানো হবে। তুরিয়া আমার সম্পর্কে একটা অভিযোগ করেছে।

-কী অভিযোগ?

-আমি নাকি আপনার প্রতি সহানুভূতিশীল! এ জন্যেই আমি ইচ্ছে করেই 'অডিও' বন্ধ করে এসেছি! নইলে এতদিন যেটা ভালো 'রেকর্ড'-সার্ভিস দিয়ে এসেছে, সেটা হঠাৎ করে নষ্ট হয়ে যাবে! সে বলেছে, ভিডিওগুলোতে আমার আচরণও কেমন যেন সন্দেহজনক। আসামীর মায়ের প্রতি কোমল আচরণ করা নিয়েও সে কথা বলতে ছাড়েনি। আসলে তুরিয়া আমাকে ঠেলে, এই দায়িত্বটা নিজে বাগাতে চাইছে। আমি আর একটা দিন সময় চেয়েছি। আর পারিবারিক প্রভাব খাটিয়ে, আপনার জেরা-পর্বটা আপাতত স্থগিত করতে পেরেছি।

-সে-ই ভালো! আপনি একজন মহিলা। এই নির্জন কুঠুরিতে আমার জন্যে আপনার উপস্থিতি হজম করা অনেক কষ্টের।

-একটা প্রশ্ন করি, উত্তর দেয়া না-দেয়া আপনার মর্জি!

-বলুন।

-কেউ ইসরায়েল থেকে বেরিয়ে কোথাও আত্মগোপন করতে চাইলে, তার জন্যে কি কোনো ব্যবস্থা আছে?

-(অবাক হয়ে) আপনার প্রশ্নটা খুবই সহজ। আবার হেঁয়ালিপূর্ণও বটে। উত্তর দিতে গেলে ঝুঁকি আছে। কী জানি হয়তো বা এটাও আমার কাছ থেকে তথ্য বের করার একটা নতুন পদ্ধতি। তবুও বলছি, ব্যবস্থা আছে। উদাহরণস্বরূপ বলছি, ধরুন আপনি আমার খালার দেয়া আংটিটা পরে, মূল মসজিদে আকসার নির্দিষ্ট একটা গাছের তলায় আসর থেকে মাগরিবের সময়টাতে গিয়ে বসে থাকলেন। পর পর কয়েক দিন বসলে, যেকোনো দিক থেকে আপনার কাছে একটা চিরকুট বাঁধা ঢিল এসে পড়বে। ব্যস! তারপর কী হবে, সেটা সহজেই অনুমেয়! আর হ্যাঁ, এটা যদি আমার কাছ থেকে তথ্য আদায় করার জন্যে ফাঁদ হয়, আপনি নিজে কিন্তু যাচাই করতে যাবেন না। যতই গোয়েন্দারা নজর রাখুক। ঢিলের

সাথে আসা চিরকুটে যে দিক-নির্দেশনা দেয়া থাকবে, সেটা পুরোনো কুদসের বিভিন্ন অলিগলির। একবার কেউ ঢিল নিয়ে গলিতে ঢুকলে, সে আর বের হয়ে আসতে পারবে না। এখানেই কোনো এক গলি থেকে ঢিল পাওয়া ব্যক্তিকে 'পিক আপ' করা হবে। টুক করে। পিছু নেয়া গোয়েন্দারা টেরও পাবে না। তাদের কাছে মনে হবে, মানুষটা ভোজবাজির মতো উবে গেছে।

-যাক নিশ্চিন্ত হলাম। এবার একটা প্রস্তাব দিতে পারি?

-শুনি প্রস্তাবটা?

-আগামী পরশু আমি শেষ বারের মতো এই নির্জন সেলে আসতে পারব। আমার ইচ্ছে, আসার আগে যেকোনো মূল্যে 'ভিডিও-অডিও' অকেজো করে দিয়ে আসব। সাময়িকের জন্য। পরে যা হয়, দেখা যাবে।

-(চোখ বড় বড় করে) এ ক'দিনে আপনার সম্পর্কে যা ধারণা হয়েছিল, সবই ভেঙে পড়ার উপক্রম! ভিডিও বন্ধ করে আসার কোনো প্রয়োজন নেই।

-আমার পুরো কথাটা শুনুন! আমি জেনেছি, দুজন সাক্ষী ছাড়া বিয়ে হয় না। কিন্তু দুই পক্ষ থেকে যদি তৃতীয় কোনো পক্ষকে বিয়ের উকিল বানানো হয়, তা হলে সেটা সম্ভব। এখানে মোবাইল নিয়ে আসা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তবুও আমি পরশু আসার সময় একটা মোবাইল নিয়ে আসব! বাইরে এক জায়গায় আপনার আম্মা ও কুদসের একজন ইমামসহ আপনার দুজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু উপস্থিত থাকবেন! আমাদের হাতে সময় থাকবে সর্বোচ্চ পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা! আপনার যদি আপত্তি না থাকে।

***

সাবেরের চোখ বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে গেল! যেন তার সামনে অবিশ্বাস্য কোনো ঘটনা ঘটেছে! একটু পরই অবাক দৃষ্টি বদলে গিয়ে, সেখানে স্থান নিল, গভীর মমতা! সীমাহীন অনুরাগ! অপার বিস্ময়!
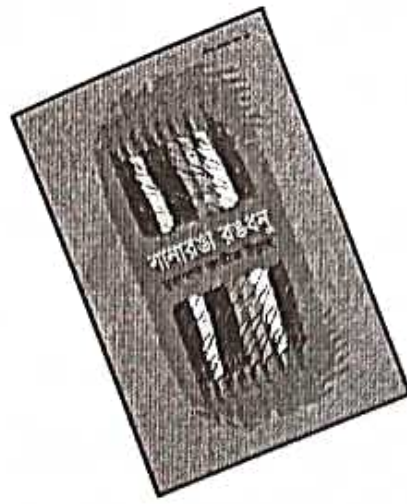
জীবন জাগার গল্প : ৬২৪

বিয়ের দ্বীপ

মসজিদটা পার হয়ে একটু ডানে গেলেই ছোট্ট একটা ঘর। ছিমছাম। বাংলোধর্মী। সুপরিসর আঙিনা আর সাগরঘেঁষা ব্যালকনিই বলে দেয়, এটি একটি আদর্শ ঘর। শান্তির কুটির। বাড়ির সামনে বিরাট নিয়নসাইন। জ্বলজ্বল করে একটা লেখা ফুটে আছে। হানিমুন!

ইংরেজি-আরবী-গ্রিক-তুর্কি ভাষায় শব্দটা ফিরে ফিরে জ্বলছে-নিভছে! সালেম থুপু এই মনোরম বাড়িটার মালিক। বাড়ি বললেও এটা মূলত পেইং গেস্ট কটেজ। সাইপ্রাসে এমন কটেজের ছড়াছড়ি। কারণটা বলার আগে একটু পেছনে যেতে হবে।

***

সাইপ্রাস দ্বীপটা মুসলমানদের অধীনে আসে আমীরুল মুমিনীন মুয়াবিয়া রা.-এর খিলাফতকালে। তারপর থেকেই এই দ্বীপ মুসলামানদের অধীনে। মাঝে অবশ্য কিছুদিন হাতছাড়া ছিল। ১৫৭১ সাল থেকে ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত এই দ্বীপ উসমানী সালতানাতের অধীনে থাকে। দ্বীপের অধিবাসীরা ছিল তুর্কি ও গ্রিক বংশোদ্ভূত। উভয় ধর্মের মানুষই মিলেমিশে বাস করে আসছিল। আরবীতে সাইপ্রাসকে বলা হয় 'কুবরুস'। শব্দটা এসেছে 'কপার' থেকে। মানে তামা। প্রাচীনকাল থেকেই এখানে তামা পাওয়া যেত, তাই এই নাম। খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০০ সাল থেকেই এখানে মানুষের বসবাস। খ্রিষ্টপূর্ব ১২০০ সালে গ্রিকরা এই দ্বীপ অধিকার করে। নগর-রাষ্ট্র স্থাপন করে। একে একে আশুরীয়, মিশরীয়, পার্সিয়ান ও রোমানরা এখানে আগমন করে। ৪৫ সালের দিকে এখানে সেইন্ট পল ও সেইন্ট বার্নাবাস আগমন করে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করে। ৩৩০ সালে সাইপ্রাস বায়জান্টাইন

সাম্রাজ্যের অধীনে চলে যায়। ১১৯১ সালে ইংল্যান্ডের রাজা সিংহহৃদয় রিচার্ড এই দ্বীপ দখল করে নেয়। রিচার্ড তখন ক্রুসেড-যুদ্ধে এসেছিল। ১৮৭৮ সালে তুর্কিরা এই দ্বীপকে ইংল্যান্ডের হাতে তুলে দেয়। বিশেষ চুক্তির আওতায়। এরপর থেকে ইংরেজরা এই দ্বীপের কর্তৃত্বে থাকে। ১৯৬০ সালে এই দ্বীপ স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৬৩ সালে দ্বীপের গ্রিক বংশোদ্ভূতরা আন্দোলন শুরু করে, তারা দ্বীপকে গ্রিসের সাথে যুক্ত করে নেবে। তুর্কি বাসিন্দারা কঠোরভাবে এর বিরোধিতা করে। শুরু হয় গ্রিসের গোপন সহায়তায় মুসলিম গণহত্যা। ১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত একটানা এক দশকেরও বেশি এই হত্যাযজ্ঞ চলতে থাকে। গ্রিকরা দ্বীপকে গ্রিসের হাতে তুলে দেয়ার প্রস্তুতি সেরে ফেলে। এমন মুহূর্তে তৎকালীন তুর্কি প্রতিরক্ষামন্ত্রী 'মরহুম নাজমুদ্দীন এরবাকান'-এর একক প্রচেষ্টায় তুর্কি সেনাবাহিনী সাইপ্রাসে সামরিক অভিযান পরিচালনা করে।

ইউরোপ এতদিন চুপচাপ থাকলেও, এবার জাতিসংঘের ছত্রছায়ায় তারা তুর্কি অভিযানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। বাধ্য হয়ে তুর্কি বাহিনী অগ্রাভিযান থামাতে বাধ্য হয়। জাতিসংঘ থেকে শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠানো হয়। এভাবে আরও এক দশক চলে যায়। ১৯৮৫ সালে তুর্কি সেনাদের দখল করা অংশকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে ঘোষণা দেয়া হয়। তুরস্ক সাথে সাথে স্বীকৃতি দেয়। আবদুর রউফ দাঙ্কতস তুর্কি সাইপ্রিয়টের শাসক। তুর্কিদের ভাগে আছে মোট ভূখণ্ডের এক-তৃতীয়াংশের কিছু বেশি। গ্রিক সাইপ্রিয়টের ভাগে বাকি অংশের কিছু কম। কিছু অঞ্চল আছে কারও সাথে নেই। কিছু এলাকা আছে শান্তিরক্ষীদের অধীনে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন গ্রিক সাইপ্রিয়টকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এদিকে তুর্কি সাইপ্রিয়টকে খ্রিষ্টানরা তো দূরের কথা, কোনো আরব রাষ্ট্রও স্বীকৃতি দেয়নি। উল্টো আরব সরকারগুলো গ্রিক সাইপ্রিয়টের সাথে বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে চলে।

***

এবার আমরা মূল গল্পে চলে আসি। আরববিশ্বের প্রায় সব দেশেই আন্তঃধর্মীয় বিয়ে নিষিদ্ধ। এমনকি কোর্টম্যারেজও নিষিদ্ধ। ভিন্নধর্মের কাউকে বিয়ে করার নিয়ম নেই। বিশেষ করে লেবাননে। এখানে তিন

সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করে। এ ছাড়াও সরকারিভাবে সব মিলিয়ে ১৮টা দল-উপদলের অস্তিত্ব স্বীকৃত। প্রধান তিনটা দল হলো মুসলিম। ম্যারোনাইট খ্রিষ্টান। শিয়া। এ ছাড়া দ্রুজ সম্প্রদায়ও আছে। মিশ্র সংস্কৃতি ও ইউরোপিয়ান কালচারের প্রচলনের কারণে লেবানন একটা ফ্রি-মিক্সিং দেশে পরিণত হয়েছে। তাই এখানে আন্তঃধর্মীয় বিয়ের সম্ভাবনা বা সংকটও বেশি। দেশীয় আইনে এমন বিয়ে রীতিসিদ্ধ নয়। বাধ্য হয়ে 'কপোত-কপোতিরা' একটা ভিন্ন পথ খোঁজে। লেবাননের অদূরেই আছে সাইপ্রাস। এখানে বিয়ের ব্যবস্থাটা একবারেই ঝুট-ঝামেলাহীন। বিশেষ করে পর্যটকদের জন্যে বিয়ে করা পানির মতোই সহজ। পর্যটকদের আকর্ষণ করতে, সরকার বিয়েকে আরও নিষ্কণ্টক আর ব্যয়ভারহীন করে দিয়েছে।

ইসরায়েলেও একই অবস্থা। এখানে বিয়ে করতে হলে, পুরোপুরি ইহুদী ধর্ম মেনেই বিয়ে করতে হয়। ইসরায়েলের তরুণ সমাজে ধর্ম মানার প্রবণতা খুবই কম। বেশির ভাগই নাস্তিক। তারাও একটা 'এস্কেপ রুট'-এর সন্ধানে ছিল। সাইপ্রাসই তাদের নিরাপদ গন্তব্য। প্রতিবছর তিন হাজারের বেশি বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এই যুগলদের বেশির ভাগই মধ্যপ্রাচ্য থেকে উড়ে আসা। এখানে বিয়ে করতে হলে, যুগলের উভয়কে কোনো ধর্মের অনুসারী হওয়া বাধ্যতামূলক না। পাশাপাশি যারা অতি রোমান্টিক, তারাও এই দ্বীপেই বিয়ে সারতে আসে। গ্রিক প্রেমের দেবী আফ্রোদিতির জন্ম এই দ্বীপেই। সাগরতীরে বিরাটাকায় একটা প্রস্তরখণ্ডও আছে, আফ্রোদিতির নামে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর এখানকার জীবনযাত্রা আরও উন্নত হয়ে গেছে। অপরদিকে তুর্কি সাইপ্রিয়ট অনেক পিছিয়ে আছে।

***

সালেমের আবাসও গ্রিক সাইপ্রিয়টে। তুর্কি অংশে অবশ্য তার অনেক আত্মীয়-স্বজন থাকে। তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগও আছে। আসা-যাওয়া আছে। গ্রিকদের গণহত্যা সত্ত্বেও এই অংশে এখনো কিছু মুসলমান রয়ে গেছে। সালেমদের পরিবার তাদেরই একজন। সালেমের প্রতিদিনের রুটিন হলো, ঘুম থেকে উঠেই একবার বিমানবন্দরে যাওয়া। নতুন কোনো

'কাপল' এসেছে কি না দেখা! তাদের নিজের গাড়িতে করে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়া।

সালেম চেষ্টা করে লেবানন ও অন্য দেশ থেকে আসা মুসলিমদের ধরতে। সে এবং তার একজন বন্ধু মিলেই একটা প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে। আজ থেকে পাঁচ বছর আগে। লেবানন থেকে আসা যুগলগুলোর প্রায় প্রতিটিতেই কেউ না-কেউ মুসলমান থাকে। হয় ছেলেটা না হয় মেয়েটা। দু-বন্ধুর চেষ্টা থাকে, এমন বিয়ে থেকে মুসলিম ছেলে বা মেয়েটাকে নিরুৎসাহিত করা। কাজটা যদিও একপ্রকার অসম্ভব, তবুও সালেমকে একেবারে ব্যর্থ বলা যায় না।

***

লেবানন থেকে যারা আসে, তারা মূলত উভয়ের ধর্ম ঠিক রেখে বিয়ে করতেই এখানে আসে। সালেমরা চেষ্টা করে ইসলামের সঠিক বার্তাটা তাদের কাছে পৌঁছে দিতে। এই চিন্তাকে সামনে রেখেই তাদের 'হানিমুন' কটেজ ব্যবসায় নামা। তারা নবযুগলকে সব ধরনের আনন্দ-উপাদান দেয়ার পাশাপাশি, ফাঁকে ফাঁকে সুযোগমতো ধর্মের কথাও শোনানোর চেষ্টা করে। সালেমের মাথায় এমন অদ্ভুত দাওয়াতী চিন্তা কোত্থেকে এল? প্রশ্নটা করেছিল ইসরায়েল থেকে আসা এক মুসলিম যুবক আর ইহুদী মেয়ে যুগল! সালেম তাদের পীড়াপীড়ি দেখে নিজের ঘটনাটা সবিস্তারে খুলে বলেছিল। ইহুদী মেয়েটা সত্যি সত্যি ভালো ছিল। বোঝানোর পর, সে ইসলামের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। অবাক করা ব্যাপার হলো, ফিলিস্তিনি ছেলেটাকে এক চুলও ধর্মের দিকে আনা যায়নি। সে তার ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থানেই গোঁ ধরে ছিল! সালেমের কথা শোনা যাক!

***

-আমরা আদিকাল থেকেই গ্রিক সাইপ্রিয়টের অধিবাসী। সত্তরের দশকের রক্তক্ষয়ী হত্যাকাণ্ডের সময়ও আমরা ভিটেমাটি ছেড়ে যাইনি। আব্বুর কথা ছিল, আমাদের পূর্বপুরুষরা সেই মুয়াবিয়া রা.-এর পাঠানো বাহিনীর সাথে এখানে এসেছে। তারা দ্বীনের দাওয়াতের স্বার্থেই এখানে যুগ যুগ ধরে বাস করে এসেছে। এখানকার খ্রিষ্টানদের মাঝে দাওয়াতী কাজ চালিয়েছে। কে জানে, আমাদের পূর্বপুরুষ হয়তো একজন সাহাবীই ছিলেন। একজন মহান পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া 'মিরাস' ছেড়ে যাওয়া গুনাহের কাজ হবে!

আব্বু আমাদের কিছুদিনের জন্যে তুর্কি সাইপ্রিয়টে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি একা একা ঘরদোর সামলেছেন। ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে গেছেন। দেশ ভাগ হওয়ার পর, গ্রিক সাইপ্রিয়টকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যপদ দেয়া হলে এখানকার পরিবেশ আমূল বদলে গেল। সেই অনেককাল আগে থেকেই আমাদের দ্বীপ ছিল পর্যটকদের প্রথম পছন্দ। গ্রীষ্মকালীন অবকাশ যাপন করতে ইউরোপ-আমেরিকা থেকে দলে দলে লোক আসত। আমাদের বাড়িটা ছিল আফ্রোদিতির পাথরের কাছে। আব্বু বুদ্ধি করে এটাকে পর্যটকদের থাকার মতো করেই বানিয়েছিলেন। নিরিবিলি। আমাদের কটেজটা আবার সরকারিভাবেও স্বীকৃত ছিল। উঁচুদরের কোনো মেহমান এলে, সরকার আমাদের এখানেও পাঠাত। এ সুবাদে হলিউডের বড় বড় নায়ক-নায়িকাও এখানে থেকে গেছে। ব্রিজিত বার্দো আর এলিজাবেথ টেলরও এখানে ছিলেন। টেলর তো আব্বুকে ভীষণ পছন্দ করেছিলেন। তিনি নাকি একদিন দুর্বল মুহূর্তে আব্বুকে বলেছিলেন :

-হায়াত, আমি যদি ইহুদীধর্ম গ্রহণ করে না ফেলতাম, তা হলে এখানে থেকে যেতাম! এখন তো আমার আর ব্যাক করার উপায় নেই! আমি একটা ঘেরা টোপের মধ্যে ঢুকে গেছি! আমি এখানে থেকে গেলে, তুমিও বিপদে পড়বে!

আব্বু বলতেন :

-হলিউডের নায়িকাগুলোর জন্যে আমার খুবই খারাপ লাগে! মেয়েগুলো ভেতরে ভেতরে কী নিঃসীম একাকিত্বে যে ভোগে! সামান্য 'আলোর' সন্ধান পেলেই পতঙ্গের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে তারা দ্বিধা করে না। তাদের কাছে ইসলামকে সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারলে, একজনও অস্বীকার করতে পারবে না। আমার অভিজ্ঞতা এটাই বলে।

আব্বু চলে গেছেন। আমি তার রেখে যাওয়া ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছি। আগে এখানে আসত নায়িকারা। এখনো আসে। তবে আমরা চেষ্টা করি, নবপরিণত যুগলকে ধরতে। বিশেষ করে মুসলিম। পুরুষদের জন্যে আমরা দু-বন্ধু আছি। মেয়েদের সাথে কথা বলার জন্যে আমার বোন তথা বন্ধুপত্নী আছে। তাকে আমরা কয়েকটা কোর্স করিয়ে এনেছি। বিভিন্ন ভাষায় দক্ষতা অর্জন করিয়েছি। দাওয়াতের পদ্ধতিগুলো শিখিয়েছি। এখন লায়লার একার পারফরমেন্স আমাদের দুজনের চেয়ে বেশি। আমরা তাকে

রীতিমতো ঈর্ষণীয় সম্মানী দিয়ে থাকি। তার সাথে গোপন চুক্তি আছে—সে যদি একটা মেয়েকে বিয়ে থেকে ফেরাতে পারে, মোটা অঙ্কের পুরস্কার। আবার ইসলাম গ্রহণ করাতে পারলে, আরও বড় পুরস্কার। না না, এখানে টাকা কোনো প্রভাব ফেলে না। টাকাটা মোটেও মুখ্য নয়।

***

একবার আমাদের বাসায় একটা যুগল এল। আমিই তাদের এয়ারপোর্ট থেকে তুলে এনেছি। অবশ্য তারা ইন্টারনেটে আগেই আমাদের 'হানিমুন' বুক করে রেখেছিল। কিন্তু চূড়ান্ত করেনি। দেখেশুনে 'ওকে' করবে, এমনটাই ইচ্ছে। দুজন দু-জায়গা থেকে এসেছে। হানা প্যারিস থেকে আর আলী এসেছে বৈরুত থেকে। হানা ম্যারোনাইট খ্রিষ্টান। আলী দ্রুজ শিয়া। বৈরুতের আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় তাদের দুজনের পরিচয়।

যাই হোক, আমরা তাদের 'হানিমুনে' এনে তুললাম। লায়লা তার মতো করে হানাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমরা আলীকে। কোনো 'কাপল' আমাদের হোটেলে এলে, আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা থাকে, বিয়ের আগে যেন তারা একসাথে রাত না কাটায়। এটা করতে হয় কৌশলে। অবশ্য খুব বেশি কৌশল খাটাতে হয় না। আমরা তাদের বলি :

-বিয়ের আগে দুয়েক রাত আলাদা থাকাই ভালো। প্রস্তুতির ব্যাপার-স্যাপার আছে। শেষদিকে দূরে থাকলে, মনের টানও বাড়ে।

আমরা আরেকটা কাজ করতাম, সুকৌশলে বিয়েটা পেছাতে চেষ্টা করতাম। আমাদের 'হানিমুনে' যারা উঠত, তাদের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব আমাদের কাঁধেই বর্তাত। অন্য মোটেল-কটেজগুলোর অবস্থাও একই। আমরা বিয়ের আয়োজনে একটু 'অগোচর' গড়িমসি করতাম। বিশেষ করে দুই কবুতরের কোনো একজন 'মুসলিম' হলে!

এবার যেহেতু দুজনের কেউই মুসলিম নয়। তবুও অলিখিত নিয়ম অনুযায়ী আমাদের কাজ শুরু করলাম। দুদিনের নিবিড় দলাই-মলাইয়ের পরও আমরা দুই বেটাছেলে দ্রুজ আলীকে একটুও কাবু করতে পারলাম না। সে কোনো ধর্মকর্মের ধারই ধারে না। তার এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। বিতৃষ্ণা আছে বলা চলে। ওদিকে লায়লা-মহলে রীতিমতো উথালপাতাল অবস্থা।

***

আমাদের এখানে যেহেতু লেবানন থেকেই বেশি মানুষ আসছে। সে জন্যে আগতদের মধ্যে নিয়মিতই দুজনের একজন খ্রিষ্টান থাকে। লায়লাকে আমরা আগেই 'ম্যারোনাইট' খ্রিষ্টানদের দাওয়াত দেয়ার পদ্ধতি শিখিয়ে-পড়িয়ে দিয়েছি। লায়লা একজন উচ্চশিক্ষিতা মেয়ে। কয়েকটা ভাষায় চোস্ত কথা বলতে পারে। আগত মেয়েরা লায়লার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ না হয়ে যাবে কোথায়। পাশাপাশি লায়লা তার বেতন-বোনাস-পুরস্কারের পুরোটাই এ খাতে ব্যয় করে। সে মেয়েদের দামি দামি উপহার দিয়ে মানসিকভাবে দুর্বল-কাবু করে ফেলে। তার যুক্তি হলো, কুরআন কারীমে তো কাফিরদের মন যোগাতে টাকা খরচ করার কথা আছে! আমি আমার টাকা খরচ করছি! একটা মানুষ ঈমান আনার বিনিময়ে সামান্য কয়েকটা ইউরোর কীইবা মূল্য? আর আমি এত টাকা যক্ষের ধনের মতো আগলে কী করব?

***

লায়লার সাথে মাত্র দু-দিন থেকেই হানার চিন্তার আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল। সে বার বার বলতে লাগল :

-আমি সবকিছু আবার নতুন করে ভাবতে চাই! আমি ঝোঁকের বশে এখানে এসেছি। আলীরা অনেক টাকার মালিক। আমার মধ্যে হয়তো টাকার মোহও কিছুটা কাজ করেছিল। কিন্তু বিশ্বাসের চেয়ে টাকা বড় হতে পারে না।

***

হানারা পারিবারিকভাবে অত্যন্ত রক্ষণশীল ম্যারোনাইট। সে জানিয়েছে, আলীর সাথে বিয়েতে রাজি হলেও, তাদের মধ্যে ভিন্ন কোনো সম্পর্ক হয়নি। ছোটবেলা থেকেই সে গির্জায় আশ্রয়ে বড় হয়েছে। তাই ধার্মিকতার প্রভাব তার মধ্যে অন্যদের তুলনায় বেশি প্রবল ছিল। হানা একদিন সরাসরি আলীর সাথে কথা বলল। আলী কিছুতেই তার সিদ্ধান্ত পাল্টাতে রাজি হলো না। উল্টো আমাদের ওপর রেগে গেল। আমরা হানার মাথা খেয়েছি। সে আমাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করবে। হানা শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে আলীর কথার উত্তর দিল। আলী তাকে অনেক করে বোঝাল। শেষ পর্যন্ত

কোনো উপায়ান্তর না দেখে, হুমকি দিল। শাসাল। এমনকি টাকা-পয়সার খোঁটা পর্যন্ত দিল। কিন্তু হানার কোনো নড়চড় নেই। লায়লা তাকে বলল :

-আলী টাকার খোঁটা দিলে, আমি তোমাকে হাওলাত দেব! সে তোমার জন্যে কত টাকা খরচ করেছে বলো! আমি দিয়ে দেব!

হানা টাকার ব্যাপারটাতে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এবার হালে পানি পেল। আলীর সাথে চূড়ান্ত একটা বোঝাপড়ায় বসল। হানা সরাসরি প্রস্তাব দিল।

-তুমি কি তোমার ধর্মবিশ্বাস নিয়ে একটু ভেবে দেখবে?

-আমি ধর্মই মানি না, ভেবে দেখার প্রশ্ন উঠবে কোত্থেকে? আমার ধর্ম নিয়ে ভাবি না বলেই তো সাইপ্রাসে আসা!

-তা হলে আমাকে একটু সময় দিতে হবে! আমি বিয়েটা আরেকটু ভেবেচিন্তে করতে চাই!

-সব ভেবেই কি এখানে আসোনি?

-এসেছি! কিন্তু তখন ধর্মের ব্যাপারটা আমার সামনে ছিল না।

-বুঝেছি, ওই ডাইনিটাই তোমার কচি মাথা চিবিয়ে খেয়েছে!

-ওনার সম্পর্কে কোনো মন্দ মন্তব্য করবে না বলে দিচ্ছি! বিয়ের আগে প্রসঙ্গটা উঠেছে ভালোই হয়েছে! নইলে একদিন পরে হোক আর দশদিন পরে, প্রসঙ্গটা উঠতই! তখন ভাঙনের সুর বাজত! আমি চাই না আমার বিয়েটা ভাঙুক! বার বার মন-দেহ বদল করতে রুচিতে বাঁধবে!

-তা হলে এই তোমার শেষকথা?

-তুমি ভুল বুঝো না! আমি এর বেশি কিছু আপাতত বলতে পারছি না। আমায় ক্ষমা করো!

***

আলী পরদিনই গটগট করে চলে গেল। লায়লা বলেকয়ে হানাকে আরও কয়েকটা দিন থেকে যেতে রাজি করাল। তিন দিনের মাথায় হানা বলল, সে এখানে আরও কয়টা দিন থাকতে আগ্রহী। আরও কয়েক দিন পর সে জানাল, ফ্রান্সে তার পড়াশোনা শেষ। চাকরির অপেক্ষায় ছিল। সাইপ্রাসে যদি একটা চাকরির ব্যবস্থা হয়ে যায়, তা হলে সে বর্তে যাবে। লজ্জার কারণে হানা আমাদের 'হানিমুনে' চাকরির কথা বলতে পারছিল না।

লায়লা সানন্দে রাজি হয়ে গেল। লম্বা সময় থাকার মতো প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র হানার কাছে ছিল না। আমরা দৌড়ঝাঁপ করে সব ঠিক করে আনলাম। তারপর থেকে হানা আমাদের ঘরেই আছে। আপন হয়ে। নিজের হয়ে। কাছের হয়ে। সেও এখন দিব্যি দায়ী হয়ে উঠেছে। লেবাননের প্রতিটি কাপলের সাথে সে-ই আগে বেড়ে কথা বলে। হানার নতুন নাম দিয়েছি 'উম্মে হানি'। হানি আমাদের পরিবারের সদস্য হওয়ার পর থেকে, আমাদের 'হানিমুনে'র ব্যবসাও অনেকগুণ বেড়ে গেছে। আগে আমরা নানা কসরত করে 'ক্লায়েন্ট' আনতাম। এখন হানার কারণেই লুবনানের বেশির ভাগ কাপল আমাদের এখানে আসে। লায়লা দুষ্টুমি করে বলে :

-হানা সত্যি সত্যি আমাদের ভাইয়ার জীবনে তো বটেই, আমাদের জন্যেও 'হানি' হয়ে এসেছে!
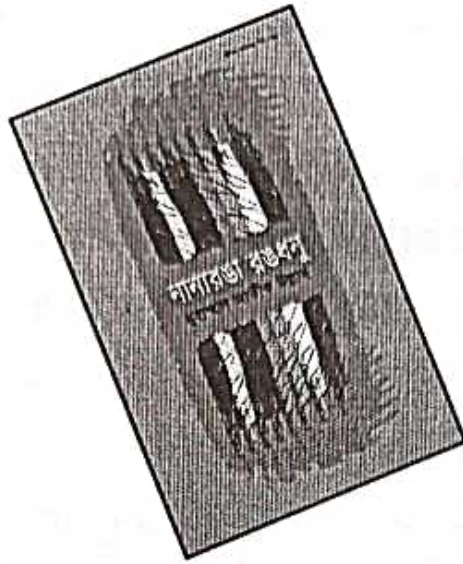
জীবন জাগার গল্প : ৬২৫

রুজ'আ/ফেরা!

তুরস্ক-সিরিয়া সীমান্তের শরণার্থী শিবির। এনজিওরা বেশ কিছু স্কুল খুলেছে এখানে। মুসলিম-অমুসলিম উভয় ধারার স্কুল আছে। যে যার মতো শিক্ষাদানকার্য চালায়। তুর্কি সরকারও এতে বাধা দেয় না। এতগুলো মানুষের সার্বিক ব্যবস্থাপনা অনেক কঠিন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা, সিরিয়ানরা যে যার মতো এগিয়ে এল। উদ্বাস্তুদের সহযোগিতায়। অর্থ, শিক্ষা, চিকিৎসা, পরামর্শ (কাউন্সিলিং), ইত্যাদি দিয়ে যে যার মতো হাত বাড়িয়ে দিল। সুলাইমান-রুফাইদা দম্পতিও এই উদ্দেশ্যে তুরস্কে এসেছে। নিজেরা সরাসরি আশ্রয়হীন মানুষগুলোর সেবায় অংশগ্রহণ করবে। তাদের পাশে দাঁড়াবে। সুলাইমান তুর্কি হলেও রুফাইদা সিরিয়ান। জন্মসূত্রে অবশ্য ডেনিশ।

বিদেশি এনজিওগুলো সীমিত পরিসরে কিছু কিছু শরণার্থীকে নিজ দেশে অভিবাসিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। স্বাভাবিকভাবেই উদ্বাস্তুরা এটাকে মহাসুযোগ মনে করে লুফে নেয়। এ তালিকায় নিজের নাম উঠাতে মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালায়। ধর্ম-আদর্শ সবকিছু বিসর্জন দিয়ে হলেও। রুফাইদা একজন ডাক্তার। তার কাজ চিকিৎসা সেবা দেয়া। সুলাইমান সিভিল-ইঞ্জিনিয়ার। মাঠপর্যায়ে কাজে নেমে স্বামী-স্ত্রী দেখল, অবস্থা সঙ্গিন। শুধু অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান নয়, ধর্মাদর্শের অবস্থাও শোচনীয়। এনজিওগুলো মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে ধর্মান্তরের তুফান বইয়ে দিয়েছে। যেসব সিরিয়ান জন্মসূত্রে খ্রিষ্টান ছিল, তারা পর্যন্ত নিজেদের মুসলমান পরিচয় দিয়ে, নতুন করে খ্রিষ্টান হচ্ছে। কারণ, তারা দেখছে, ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে।

***

যুদ্ধ শুরু হওয়ার বহু আগে থেকেই কোপেনহেগেনে ছোট্ট একটা সিরিয়ান কমিউনিটি ছিল। মুসলিম-খ্রিষ্টান-আলাবী তিন সম্প্রদায়েরই লোক ছিল। রুফাইদা ছিল মুসলিম-সম্প্রদায়ের। পড়াশোনা, বেড়ে ওঠা সম্পূর্ণ ডেনিশ রীতিতেই হয়েছিল। তারপরও পারিবারিকভাবে কিছুটা ধর্মশিক্ষাও পেয়েছিল। লেখাপড়া শেষ করার পর চাকরি পেতে দেরি হয়নি। তারপর বিয়ে। নানা ঘটনার জের ধরে স্বামী-স্ত্রী ঠিক করল, ডেনমার্কে আর থাকবে না। কোনো মুসলিম দেশে চলে যাবে। দুজনের যা যোগ্যতা আছে কিছু একটা করে খেতে বেগ পেতে হবে না। আল্লাহ সহায় থাকলে কোনো চিন্তা নেই। এ চিন্তা থেকেই তুরস্কে আসা। সুলাইমানের নিজের বাড়ি যেহেতু এখানে।

দুজনে তুরস্কে ফিরে ঠিক করল, জমানো টাকা যা আছে সেটা দিয়ে কিছুদিন মানবসেবা করা যাক। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয়া যাবে। দুই সন্তানকে দাদা-দাদুর কাছে রেখে সীমান্তে চলে এল। উদ্বাস্তুদের জন্যে কিছু করার আগ্রহে। রুফাইদা দেখল, এখানে মানুষের শারীরিক চিকিৎসা যেমন দরকার, আত্মিক চিকিৎসা আরও বেশি দরকার। প্রায় সবাই ভাবছে, ইউরোপে যেতে পারলেই কেল্লা ফতে। জান্নাত নসীব হয়ে যাবে। আসলে যে তারা জাহান্নামের পথে পা বাড়াচ্ছে সেটা টের পাচ্ছে না। স্বামী-স্ত্রী মিলে পরামর্শ করল। কী করা যায়! কী করে মানুষের মধ্যে সঠিক চিত্রটা তুলে ধরা যায়!

নিজের ডাক্তার পরিচয় কাজে লাগিয়ে, বিভিন্ন ক্যাম্পে গেল। তথ্য সংগ্রহ করল। জনে জনে কথা বলল। মহিলাদের সাথে ঘরোয়া সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করল। বোঝাতে চেষ্টা করল। এতে খুব একটা কাজ হলো না। এবার জামাই-বউ দুজনে বুদ্ধি করে, আরও কিছু মানুষ জোগাড় করে একটা স্কুল খুলল। শিশু ও বয়স্ক উভয়ের জন্যে। ছোটদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেয়া হবে। আর বয়স্কদের হাতের কাজ শেখানো হবে। আর যারা ইউরোপে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে, তাদের জন্যে স্বল্পমেয়াদী ভাষাশিক্ষার কোর্স থাকবে।

এই বুদ্ধি কাজে লাগল। স্কুলটা জমে উঠল। বয়স্কদেরটাও ভালো সাড়া ফেলল। বিশেষ করে ভাষাশিক্ষারটা। রুফাইদা দেখে মহিলা-শাখা, আর সুলাইমান পুরুষ-শাখা। একটা ব্যাচ তৈরি হলো। তারা ইউরোপের বিভিন্ন

দেশে যাবে। রুফাইদা বেছে বেছে শুধু মুসলিম যুবতীদের নিয়ে বিশেষভাবে একটা বৈঠকের আয়োজন করল। একান্ত ঘরোয়াভাবে। সতর্কতার সাথে খেয়াল রাখল, যাতে কোনো খ্রিষ্টান এই বৈঠকে ঢুকে না পড়ে। নির্দিষ্ট সময়ে সবাই উপস্থিত হলো। রুফাইদা কথা শুরু করল। প্রথমেই মূল প্রসঙ্গে চলে যাওয়া ঠিক হবে না। একটু ঘুরিয়ে আনতে হবে। অবশ্য এর আগে সবার সাথে আলাদা আলাদা অনেক কথা হয়েছে। তাদের চিন্তাগুলো সংশোধনের চেষ্টা করা হয়েছে। পুরোপুরি কাজ হয়নি। আল্লাহর ওপর ভরসা করে কথা শুরু করল।

আপনাদের আমি নিজের কথা বলেছি। আপনারা জানেন আমি ও আমার পরিবার পাকাপাকিভাবে ডেনমার্ক ছেড়ে চলে এসেছি।

-কেন এসেছেন, আরেকটু খুলে বলুন। আমাদের ভাবতে সুবিধা হবে। সবাই হয়তো সবকিছু জানতে পারেনি।

-আপনাদের আমার জীবনের দুটি দিক নিয়ে বলব। আমার তুরস্কে আসার পেছনে সে দুটি দিকই মূল উৎস হিশেবে কাজ করেছে বলে আমার বিশ্বাস!

আমার চাচাতো বোন! সে সিরিয়া-সংকটের প্রথম দিকে স্বামীসহ ডেনমার্কে চলে গিয়েছে। আগে থেকে আত্মীয়-স্বজন সেখানে থাকায় এটা তার জন্য সহজ হয়েছিল। তাদের দুটি সন্তান। বড়টি মেয়ে। তাকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়া হলো। স্কুলে শারীরিক-শিক্ষা ক্লাসে, শরীরচর্চার পর সবাইকে সুইমিংপুলে গোসল করতে হয়। 'কস্টিউম' পরে। ছেলে-মেয়ে একসাথে। ব্যাপারটা জানার পর, ভগ্নিপতি মেয়েকে স্কুল থেকে নিয়ে এলেন। স্কুল-কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করলেন, যেন তার মেয়েকে এই লজ্জাজনক পোশাক পরতে বাধ্য করা না হয়। কর্তৃপক্ষ বলল :

-এ অসম্ভব! ড্রেসকোড মানতে হবে। এর ব্যতিক্রম করা যাবে না।

-তা হলে আমার মেয়েকে আমি এখানে পড়াব না।

-সেটা আপনার ব্যাপার! কিন্তু ডেনমার্কে থাকতে হলে, আপনার বাচ্চাকে স্কুলে দিতেই হবে।

***

স্বামী-স্ত্রী ঠিক করল, ডেনমার্কে থাকবে না। যেখানে ইজ্জত-আবরু নিয়ে থাকা যায় না, সন্তানদের শালীনতা-হায়া শরমের মাঝে গড়ে তোলা যায় না, সেখানে কোনো মুমিনের থাকা সাজে না। দরকার হলে সিরিয়াতে

ফিরে যাব। সেখানে গেলে অন্তত ঈমানের সাথে মরতে পারব এ নিশ্চয়তা আছে। অন্তত আল্লাহর কাছে বলতে পারব, আমরা ঈমান বাঁচাতে চলে এসেছি।

-তারা কি এখনো সিরিয়াতে?

-না এখনো যেতে পারেনি। তবে একটা সাময়িক সমাধান হয়েছে। পরে স্কুল-কর্তৃপক্ষ দাবি মেনে নিয়েছে। কস্টিউম পরার ক্ষেত্রে ছাড় দিতে রাজি হয়েছে। যৌথ সুইমিংপুলে সাঁতার কাটতে হবে না, এ মর্মে আশ্বাস দিয়েছে।

***

আমি এ ঘটনার পর, বড় একটা ধাক্কা খেলাম! আমার সন্তানদের অবস্থা কেমন হবে? তারা তো ছাড় পাওয়ার কথা নয়। ওরা ছাড় পেয়েছে। উদ্বাস্তু বলে বদনাম হওয়ার ভয়ে স্কুল-কর্তৃপক্ষ মেনে নিয়েছে। এখানে থাকতে হলে ছেলেমেয়েদের সত্যিকার ইসলামী শিক্ষা দেয়া প্রায় অসম্ভব! সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাড়াতাড়ি!

এটা ছিল দ্বিতীয় ঘটনা। প্রথম ঘটনার পর থেকেই আমার ভাবান্তর তৈরি হয়েছিল। ঘটনাটা আমার সন্তানকে নিয়ে। আমি বিয়ের আগে থেকেই চাকরি করতাম। কথা ছিল বিয়ের পরও করব। এটা বলার দরকার ছিল না। তবুও পরে যাতে ঝামেলা না বাঁধে সে জন্যে বলে রাখা। বিয়ের পর আমার ব্যস্ততা যেন পাল্লা দিয়ে বাড়তেই থাকল। এর মাঝে কোলজুড়ে প্রথম সন্তান এল। ছুটি নিলে পিছিয়ে পড়ব। ছিটকে পড়ব। তাই ওদিকে গেলাম না। বেবি সিটার রেখে দিলাম। আরও কয়েকজনের সন্তানও থাকত। এভাবে দিন কেটে যাচ্ছিল।

একবার ছুটিতে আমরা তুরস্কে এলাম। সুলাইমানদের বাড়ি শহর থেকে অনেক দূরে। পাহাড়ি অঞ্চলে। সম্পূর্ণ গ্রামীণ পরিবেশে তার বাবা-মা থাকেন। আধুনিকতার ছোঁয়ামুক্ত। অবশ্য নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সবই ছিল। বিদ্যুৎ-টেলিফোন ছিল। শুধু আবহটা প্রাচীন। আমার ভাল লাগল। মেয়েরা সবাই ঘরের কাজ করে। কেউ চাকরি করে না। বাইরেও তেমন একটা যায় না। তুরস্কের শহরের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। শহরগুলোতে গেলে মনে হয় ইউরোপের কোনো শহরে হাঁটছি। প্রত্যন্ত তার গ্রামের চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত।

ছুটি কাটিয়ে ফিরে এলাম। সন্তান বড় হতে লাগল। কথা বলতে পারে। আমার প্রমোশন হলো। দায়িত্ব বেড়ে গেল। প্রতিদিন সকালে দুজনে একসাথে বেরিয়ে যেতাম। ফিরতে ফিরতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। বাচ্চাটা পুরো সময় আয়ার কাছে থাকত। ঘরে ফিরে আর বেশি কিছু করতে ইচ্ছে হতো না। এমনকি স্বামীর সাথে প্রেমও না। আগামীকাল আবার দৌড়াতে হবে যে! রাতটা ভালো করে না ঘুমালে কাজ করা যাবে না। ছেলেকেও সময় দিতে পারি না। কখনো কখনো মনে হতো, ছেলেটা আমাকে মা বলেও চেনে না। আয়াকেই সে মা বলে চেনে। স্বামী কখনো এসব নিয়ে অভিযোগ করত না। কিন্তু জীবনটা একেবারে রোবটিক হয়ে কেটে যাচ্ছিল না। মাঝেমধ্যে ছুটির দিনগুলোতে বুঝতে পারতাম। কী যেন এক শূন্যতা মনের গহিনে ছেয়ে থাকত। মনে হতো এভাবে হয় না। জীবন চলে না। চলতে পারে না।

ছেলে আমাকে পায়ই না। পাবে কীভাবে! সে যখন জাগে তখন আমি কাজে। আমি যখন ফিরি সে তখন ঘুমে। ঘরটা কেমন বদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। একদিন দেখলাম ছেলেটা আয়াকেই মা বলে ডাকছে। ভীষণ ধাক্কা খেলাম। আমাকে দেখলে তার মধ্যে কোনোরকম ভাবান্তর তৈরি হয় না। কিন্তু সকালবেলায় যখন আয়ার কোলে তুলে দিই, তখন সে ঝাঁপিয়ে তার কোলে যায়। বিকেলে আমি ফিরিয়ে আনতে গেলে যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার সাথে আসছে। কেমন যেন নিষ্প্রাণ! বার বার আয়ার দিকে ফিরে ফিরে চায়। ঘাড় ঘুরিয়ে।

মনটা ভীষণ ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ল। মাতৃত্বের স্বাদ পাওয়ার ঈর্ষা। আমার সন্তান আমার চেয়ে আরেকজনকে বেশি ভালোবাসবে! আরেকজনকে মা ডাকবে! এটা একজন মা কী করে মেনে নিতে পারে? সহ্য করতে পারে? আমি ভাবতে বসলাম। ভাবার পর কয়েক দিনের জন্যে ছুটি নিলাম। স্বামীকে জানতে দিলাম না। ভাব করলাম তার সাথেই অফিসে যাচ্ছি। ছেলেটাকে নিজের কাছে রাখলাম। কল্পনা করলাম :

-আমি যদি এভাবে ছেলে থেকে দূরে থাকি, আয়া-বেবি সিটার দিয়ে কাজ সারি, ছেলে-মেয়ে আমার প্রতি বিন্দুমাত্র দায়িত্ব বোধ করবে না। শ্রদ্ধা হয়তো সামান্য করবে, কিন্তু বাস্তবতার ধাক্কায় সেটা উবে যেতে দেরি হবে না। অথচ সুলাইমানের বাড়িতে ভিন্ন চিত্র দেখে এসেছি। সুলাইমান এখনো তার বাবা-মায়ের প্রতি কী টান অনুভব করে! প্রতিদিন কী গভীর

আবেগ নিয়ে মায়ের সাথে ফোনে কথা বলে! আমাকে মনোভাব বুঝতে দেয় না। আমি স্ত্রী হিশেবে তার কোনো হকই তো আদায় করতে পারছি না। যদি সে স্ত্রীর প্রাপ্য লাভের জন্যে দেশে গিয়ে আরেকটা বিয়ে করে, আমার বাধা দেয়ার মতো কোনো যুক্তি থাকবে না। কল্পনার চোখে দেখলাম, আমি বুড়ি হয়ে গেছি! অথর্ব! ছেলে-সন্তান যে যার পথ ধরেছে! আমি বুড়ি একাকী ঘরে পড়ে আছি! দেখার মতো কেউ নেই! থাকবে কী করে? আমি কি তাদের দেখেছিলাম?

ব্যস! আর বেশি ভাবাভাবিতে গেলাম না। সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম। যা হওয়ার হবে। আমি আর চাকরি করব না। স্বামীর সেবা করব। সন্তানকে গড়ে তোলার পেছনে সময় দেব। ছুটি শেষ হলো। একদিন স্বামীকে সব খুলে বললাম। তার মুখের অভিব্যক্তি দেখে বুঝলাম, ভীষণ খুশি হয়েছে। কিন্তু মুখে বলল :

-আমি তোমাকে বাধ্য করব না। তোমাকে সব সময় কাছে পাব, ছেলেটা কাছে পাবে, এটা আমার জন্যে বিরাট পাওয়া! তারপরও যদি আমার জন্যে তুমি নিজেকে গুটিয়ে নিতে চাও! তা হলে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার আগে আরেকটু ভেবে দেখো!

-নাহ, সব ভাবনা শেষ। এবার কাজের পালা!

-রুফাইদা, তোমার এই সিদ্ধান্তে আমার কী যে খুশি লাগছে বলে বোঝাতে পারব না!

***

নতুন জীবনে প্রবেশ করলাম। আগে অনেককে খুশি রাখতে হতো। এখন শুধুই নিজেকে খুশি রাখা। স্বামীকে খুশি রাখার মাধ্যমে। সন্তানকে গড়ে তোলার মাধ্যমে। আরেকটা সন্তান নিয়ে ফেললাম। আল্লাহ আমাদের চাওয়া পূরণ করেছেন। ছেলেমেয়ের স্কুলের বয়স হয়ে আসছে। আমরা চিন্তায় পড়ে গেলাম। তাদের সঠিক লেখাপড়া নিয়ে। এরই মধ্যে আমার চাচাতো বোনের ঘটনাটা ঘটল। এসব সামনে রেখে, একদিন সুলাইমানকে বললাম :

-এক কাজ করলে কেমন হয়! আমরা তুরস্কে চলে গেলে!

-সেখানে?

-আমার বেশ কিছু টাকা জমানো আছে। তা দিয়ে আপাতত কিছুদিন সিরিয়ান অসহায় মানুষগুলোর সেবা করব। তারপর যা হয় একটা কিছু

ভাবা যাবে। আর আমি চাচ্ছি না, আমাদের সন্তানেরা এখানে বেড়ে উঠুক! তারপর থেকে গোছগাছ শুরু হলো। সুলাইমান সাথে সাথে প্রস্তাবটা মেনে নেয়নি। ভাবার জন্যে সময় নিয়েছে। তারপর সানন্দে রাজি হয়েছে।

***

বোনেরা, তোমাদের চোখে রঙিন স্বপ্ন দেখতে পাচ্ছি। ভাবছ, ইউরোপে গেলেই স্বর্গ পেয়ে যাবে। ভুল! অনেক বড় ভুল! ইউরোপ তোমাদের পার্থিব কিছু 'চাকচিক্য' দেবে! কিন্তু চারদিক থেকে যে খবর পাচ্ছি তা খুব সুখকর নয়! আমাদের বোনেরা ধর্ম, চরিত্র, স্বভাব সবকিছুই খুইয়ে বসছে! অনেকে তো পালাবার পথ খুঁজছে! ভাবছে, এর চেয়ে আসাদের বোমায় মরে যাওয়াও ভালো ছিল। অন্তত শহীদ হওয়ার সুযোগ থাকত! এক আঘাতেই মৃত্যু ঘটত! কিন্তু এখন রিফিউজি ক্যাম্পগুলোতে অনেকে তিলে তিলে মরছে। না না, খাবারের সংকটের কারণে নয়, আদর্শের সংকটের কারণে! আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি! এবার তোমাদের সিদ্ধান্ত নেয়ার পালা! যদি তোমরা হিম্মত করে থেকে যাও, ইনশা আল্লাহ কথা দিচ্ছি, আমরা তোমাদের ভালো বিয়ের ব্যবস্থা করে দেব! সুখে থাকার, ইজ্জত-আবরু রক্ষা করে থাকার ব্যবস্থা করে দেব! অন্তত সম্মানজনক মৃত্যুর নিশ্চয়তা দিতে পারব! সীমান্ত খোলাই আছে! ওপারে আছে একদল হায়েনা! তারা আমাদের দেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে! আমরা ইচ্ছে করলেই, প্রতিশোধের জন্যে ফিরে যেতে পারব! ইউরোপে চলে গেলে আর ফেরার সুযোগ নাও মিলতে পারে! কিন্তু এখানে থেকে গেলে, সব সময় জান্নাতের হাতছানি থাকবে! ওদিকে গেলে থাকবে জাহান্নামের হাতছানি! কোনদিকে যাবে? রবের দিকে নাকি শয়তানের দিকে? তোমরা শোনোনি?

إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ

এটা নিশ্চিত যে, তোমার প্রতিপালকের কাছেই সকলকে ফিরে যেতে হবে। -আলাক (৯৬) : ৮

সমাপ্ত

আলহামদু লিল্লাহ